

তিনি ও বন্যা

মুহাম্মদ জাফর ইকবাল



সূচি	
প্রচ্ছু	৭
গাউল	১৮
শকসো	২৬
ফাণী	৪২
হেঁচকি	৫৪
নৃপুর	৬২
তিনি ও বন্যা	৭৬



ବୁମ୍ପୁ

ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷେ ସିଲେଟ ଥେକେ ବୁମ୍ବର ଆମାକେ ଚିଠି ଲିଖିଲ, ଚିଠିର ବିଷୟବନ୍ତ ଏରକମ : ଅନେକଦିନ ଆମାକେ ଦେଖେ ନା, ଆମି କି ଆଗେର ମତୋଇ ବେକୁବ ଆଛି, ନାକି କିଛୁ ବୁନ୍ଦିଶୁଦ୍ଧି ହେଁଯେଛେ ପେଟୋ ଦେଖାର ତାର କୌତୁଳ । ତାଇ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହବାର ପରଇ ଆମି ସେଇ ସିଲେଟ ଚଲେ ଆସି ।

ବୁମ୍ବର ଆମାର ଛୋଟ ଖାଲାର ମେଘେ, ବୟସେ ଆମାର ଥେକେ ବହର ଦୁଇୟକ ବଡ଼ ହତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତ ଖୁବ ଚ୍ୟାଟାଂ ଚ୍ୟାଟାଂ ! ତାକେ ଦେଖେ ମନେ ହ୍ୟ କେଉ ବୁଝି ଏକଟା ଶୁକନୋ କାଠିର ମାଝେ ଆଲୁ ଗେଂଥେ ଦିଇଯେଛେ । ତାର ଛୋଟଜନେର ନାମ ବାବୁ ଯଦିଓ ତାର ଚେହାରାର ମାଝେ କୋନୋ ବାବୁଙ୍ଗାନାର ଚିଙ୍ଗ ନେଇ—ଗାବଦା-ଗୋବଦା ବୋକା-ବୋକା ଚେହାରା ।

ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହଲେ ସବାଇ କତରକମ ଆନନ୍ଦ କରେ—ନାଟକ-ସିନେମା ଦେଖେ, ଗିଟାର ବାଜାନୋ ଶେଷେ, ହୈଟେ କରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ, କେଉ-କେଉ ଆବାର କଞ୍ଚକାଜାର ରାଙ୍ଗମାଟି ବେଡ଼ାତେ ଯାଯ । ଆମି କଥନୋ କିଛୁ କରି ନି, ତାଇ ବୁମ୍ବରେର ଚିଠି ପେଯେ ଏବାରେ ଆମି ଠିକ କରେ ଫେଲଲାମ ଯେ-କରେଇ ହୋକ ସିଲେଟ ଯେତେ ହବେ । ଆବା-ଆମାର ପିଛନେ ଘ୍ୟାନଘ୍ୟାନ କରେ ଜ୍ଞାନାତମ ଶୁଣ କରଲାମ । ଆମାର ଘ୍ୟାନଘ୍ୟାନ କରାଯ କାଜ ହଲ ବଲା ଯେତେ ପାରେ, ଏକରକମ ବିରକ୍ତ ହେଁଇ ଆବାର ପରିଚିତ ଏକ ବନ୍ଦୁର ସାଥେ ଆମାକେ ସିଲେଟେ ଖାଲାର ବାସାୟ ପାଠିଯେ ଦିଲେନ ।

ଆମି ଯଥିନ ଛୋଟ ଖାଲାର ବାସାୟ ପୌଛାଲାମ ତଥିନ ସଙ୍କେ ହେଁସ ଗେଛେ । ଦରଜା ଖୁଲେ ଦିଲ ପ୍ରାୟ ପରୀର ମତୋ ଦେଖିତେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଚେହାରାର ଏକଟା ମେଘେ । ଆମାକେ ଦେଖେ ଚିଢିକାର କରେ ବଲଲ, “ଏସେ ଗେଛେ ! ଏସେ ଗେଛେ !! ରାଜୁ ଏସେ ଗେଛେ ! ପିପିଲିକାଭୁକ ରାଜୁ !”

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন নাকি মাঝে মাঝে পিংপড়া মেরে খেতাম—সেজন্যে কেউ-কেউ আমাকে পিপীলিকাভুক রাজু ডাকে, কিন্তু এই যেয়েটি কেমন করে আমার এই নামটা জানল! আমি অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকালাম এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম সে ঝুমুর! ছোট খালার বড় মেয়ে যাকে এই কয়দিন আগেও দেখাত একটা কাঠির মাঝে গেঁথে-রাখা আলু। আমি অবাক হয়ে বললাম, “ঝুমুর! তুমি?”

ঝুমুর চোখ পাকিয়ে বলল, “ঝুমুর কী বে? আমি তোর বড় না? বল ঝুমুর আপু—”

আমি বললাম, “ঝুমুর আপু? তুমি—তুমি—”

“আমি কী?”

“তুমি দেখতে ভালো হয়ে গেছ!”

ঝুমুর আপু খপ করে আমার চুলের গোছা ধরে বলল, “তার মানে তুই বলতে চাস আমি আগে দেখতে ভালো ছিলাম না?”

আমি নিজেকে কোনোভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, “ছিলে না তো! আগে দেখতে ছিলে একটা ঝাড়ুর কাঠির আগায় একটা আলু—”

“দেব একটা থাবড়া—” বলে ঝুমুর আপু সত্যি সত্যি থাবড়া দেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু তার আগেই আমাদের চ্যাচামেটি হৈচে শনে ছোট খালা ছোট ঝালু হাজির হলেন, পিছুপিছু বাবুও এসে হাজির হল। আমি সালাম করলাম, ব্যাগ রেখে মাঝের চিঠিপত্র আর মিষ্টির বাল্ল বের করে দিলাম, অনেক দিন পর দেখা হলে সবার যেরকম আহা উহু করার কথা সেসব করা শুরু হল।

গোসল থাওয়া সবকিছু সেরে রাতে আমরা বাক্তারা গল্প করতে বসেছি। ঝুমুর আপু এবারে ক্লাস নাইনে উঠবে, কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সে বুঝি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে গেছে। কথাবার্তায় খুব তেজ, আমাকে জিজ্ঞেস করল, “কয়দিন থাকবি, নাকি আশু আশু করে কেঁদে ভাসাবি?”

আমি ঘাড় শক্ত করে বললাম, “কী বল তুমি! একশোবার থাকব।”

“গুড়। কয়দিন থাক, অনেক মজা করব আমরা। আমি একটা দল খুলেছি, সেটার মেষ্টাৰ করে দেব তোকে।”

“কিসের দল?”

“নাম দিয়েছি কুদুদ।”

“কুদুদ? এটা আবার কীৱকম নাম?”

“কুসংকার দূৰীকৰণ দল। সংক্ষেপে কুদুদ। সব কুসংকার দূৰ করে ফেলব একে একে। একটা খাতা কিনে সেখানে কুসংকারের লিষ্ট করা শুরু করেছি। দুইশো নয়টা লেখা হয়েছে।”

“দূর হয়েছে কয়টা?”

“সাতাশটাৰ মতো। তুই এসেছিস এখন তোকে দিয়ে কাল আটাশ
নম্বৰটা ট্ৰাই কৰব।”

“সেটা কী?”

“পিপড়া খেলে নাকি মানুষ সাঁতাৰ শেখে। কাল দুই-এক ডজন পিপড়া
খেয়ে পানিতে লাফ দিবি।”

“আমি কেন?”

“আৱ কে পিপড়া খেতে রাজি হবে? মনে নেই তুই ছোট থাকতে কিল
মেৰে পিপড়াকে আধমৰা কৱে টপ কৱে খেয়ে নিতি?”

“ছোট থাকতে মানুষ তো কত কীই কৱে—কাপড়ে পেশাৰ কৱে দেয়!
তাই বলে—”

কথা শেৰ কৱাৰ আগেই ঝুমুৰ আপু আৰাৰ আমাৰ চুলেৰ গোছা ধৰে
ফেলল।

ঝুমুৰ আপুৰ এই ধৰনেৰ শাৱীৱিক নিৰ্যাতনেৰ পৱেও ছোট খালাৰ
বাসায় আমাৰ খুব চমৎকাৰ সময় কাটতে লাগল। পৱীক্ষা শেৰ, পড়াশোনাৰ
চিঞ্চা নেই—যা ইচ্ছে তা-ই কৱা যায়। ঝুমুৰ আপু আগেও একটু পাগলাটে
ধৰনেৰ ছিল, এখন পাগলামো আৱও বেড়ে গেছে। বাবু তাকে ঝুঃপু বলে
ডাকে। প্ৰথমবাৰ শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, “ঝুঃপু? সেটা আৰাৰ
কী?”

বাবু দাঁত বেৱ কৱে হেসে বলল, “ঝুমুৰ নামেৰ আপু—ঝুঃপু।
মধ্যপদলোপী তৎপুৰুষ।”

বাবুৰ দেখাদেখি আমিও ঝুমুৰ আপুকে ঝুঃপু নামে ডাকতে শুন্দ
কৱলাম, প্ৰথম প্ৰথম চোখ পাকিয়ে তাকালেও শেষে মেনে নিল।

সিলেট শহৱেৰ আশেপাশে বেড়ানোৰ জন্যে অনেক রকম মজাৰ মজাৰ
জায়গা আছে। টিলা, চা-বাগান, ঝৱনা, বিশাল হাওৱ। বেড়াতে এসেছি
বলে ছোট খালু সব জায়গায় যাওয়াৰ ব্যবস্থা কৱে দিচ্ছেন। মাইক্ৰোবাসে
কৱে যাই, সাথে থাকে খাওয়াৰ প্যাকেট, পানিৰ বোতল, মাথায় টুপি,
পকেটে ক্যামেৰা—একেবাৱে স্ফূর্তিৰ ফাটাফাটি অবস্থা।

মনে হয় সব ভালো জিনিসেৱই শেষ থাকে, আমাদেৱ এই ঘুৰে
বেড়ানোৰ আনন্দেৱও শেষ ঘনিয়ে এল। একদিন ভোৱেলা জামশেদ মামা
এসে হাজিৱ হলেন।

জামশেদ মামা হচ্ছেন আমার মারের চাচাতো ভাই, পৃথিবীতে তাঁর থেকে নীরস খুঁতখুঁতে এবং খিটখিটে যেজাজের আর কোনো মানুষ আছে বলে আমার জানা নেই। জামশেদ মামা পৃথিবীর একটি জিনিসকেও এখন পর্যন্ত ভালো বলেন নি, সবকিছুর মাঝেই তিনি কোনো-না-কোনো দোষ খুঁজে পান। আমি একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি জামশেদ মামার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে দেখা হলে ভুক্ত কুঁচকে বলতেন, “রবীন্দ্রনাথ সাহেব, সোনার বাংলা গানটা কীরকম একটা গান হল? জাতীয় সঙ্গীতের জন্যে আরও তালের একটা গান লিখতে পারলেন না?” বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হলে বলতেন, “সাতই মার্চের ভাষণটা বেশি সুবিধের হয় নাই, আমারে গোলমাল আছে।” শুধু তা-ই না, হাসরের ময়দানেও নিশ্চয়ই খোদাকে বলে বসবেন, “খোদা, পৃথিবীটাকে গোল না করে যদি চ্যাপটা করে তৈরি করতে মনে হয় ভালো হত!”

এই হচ্ছে আমাদের জামশেদ মামা। সব সময় নাক চোখ মুখ কুঁচকে রেখেছেন। যেটাই দেখছেন সেটা দেখেই বিরক্ত হচ্ছেন এবং রেগে যাচ্ছেন। শুধু এটা হলে আমাদের কোনো অসুবিধে ছিল না, কিন্তু আমাদের বিপদ এল অন্যদিক দিয়ে। আমরা যখন নানা জায়গায় বেড়াতে বাচ্ছি তখন সাথে একজন বড় মানুষ হিসেবে জামশেদ মামাকে জুড়ে দেওয়া শুরু হল। ঘুরে বেড়ানোর পুরো আনন্দটা মাটি হয়ে গেল আমাদের।

একদিন আমরা জাফলং বেরাতে গেলাম, সিলেট শহর থেকে দুই ঘণ্টার রাস্তা। জামশেদ মামা সাথে থাকবেন বলে আমরা যেতেই চাহিলাম না, কিন্তু পরে শুনলাম জায়গাটা খুব সুন্দর, একেবারে বর্ডারের কাছে, পাহাড়ি ঝরনা আর নদী। সব শুনে শেষ পর্যন্ত আমরা যেতে রাজি হলাম।

মাইক্রোবাস যাচ্ছে, আমি, ঝুঁপ্পু আর বাবু পিছনে বসে রাস্তার মানুষগুলিকে নিয়ে একটা খেলা আবিষ্কার করছি তখন জামশেদ মামা মনে হয় সময় কাটানোর জন্যে আমাদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। আমার দিকে ভুক্ত কুঁচকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “এই ইয়ে তোমার নাম যেন কী?”

মামা সব সময় ভান করেন আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষদের নাম তাঁর মনে থাকে না। আমি বললাম, “রাজু।”

“অ। কোন ক্লাসে পড়?”

এটাও আগে বলা হয়েছে, তবু আবার বলালাম, “ক্লাস এইটে উঠব।”

মামা নাক কঁচকালেন যেন আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধি বের হয়েছে, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, “এত বড় ধামড়া ছেলে ক্লাস এইটে? আমি তোমার বয়সে এস. এস. সি. দিয়েছি।”

রাগে আমার পিতি জুলে গেল, ছেঁট থাকতে একটা ডাবল প্রমোশন পেয়েছিলাম বলে বয়স অনুযায়ী আমি এক ক্লাস উপরে। কিন্তু মামাকে সেই কথা বলার ইচ্ছাও হল না। জামশেদ মামা এবারে উদাস চোখে ঝুঁপ্পুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি কোন ক্লাসে?”

ঝুঁপ্পু অথবে না শোনার ভাব করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। মামা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতেই সে এক ক্লাস বাঢ়িয়ে বলল, “ক্লাস টেনে।”

মামা ভুক্ত কুঁচকে বললেন, “সেদিন যে বললে ক্লাস নাইন?”

ঝুঁপ্পু দাঁত বের করে হাসার ভাব করে বলল, “দেখছিলাম আপনার মনে আছে কি না।”

মামা খোঁচটাকে সহজভাবে নিলেন না। খানিকক্ষণ চোখ কুঁচকে ঝুঁপ্পুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমাদের ক্লাসে আজকাল পড়াশোনা হয়?”

ঝুঁপ্পু ঘাড় বাঁকা করে বলল, “হয়।”

“কী পড়ায়?”

“ইংরেজি বাংলা অঙ্ক এইসব।”

জামশেদ মামা ঠোঁটটা একটু কোঁচকালেন। মামার চেহারাটা মনে হয় খারাপ না, কিন্তু আমরা তাঁকে দুচোখে দেখতে পারি না বলে তাঁকে দেখতে আমাদের কাছে বিচ্ছিরি লাগে। ফরসা তেলতেলে মুখ, নাকের নিচে লালচে গোফ, মোঢ়া ঠোঁটের আড়ালে কালচে জিব। মামা জিব দিয়ে ঠোঁট চেঁটে বললেন, “আজকাল কি আর ক্লাসে পড়াশোনা হয়? আমাদের সময় যারা এস. এস. সি.-তে ফেল করত তারাও আজকালকার বি. এ. এম. এ. থেকে বেশি ইংরেজি জানত।”

ঝুঁপ্পু বুবো ফেলার ভাব করে বলল, “তা তো হতেই পারে। তখন ব্রিটিশরা শাসন করত, ইংরেজির উপর জোর ছিল অনেক বেশি।”

জামশেদ মামা একটু রেগে উঠে বললেন, “ব্রিটিশরা ছিল ফটি সেতেনের আগে। তোমাদের ইতিহাস পড়ায় না?”

“পড়ায়।” ঝুঁপ্পু চোখেমুখে একটা উদাস ভাব ফুটিয়ে বলল, “আমি ভেবেছিলাম আপনি ব্রিটিশ আমলের মানুষ। অনেক বয়স দেখায় তো!”

মামা এবারে মুখ ভেঁতা করে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখে হাত বুলালেন, গৌফে হাত বুলালেন, চুল টেনে দেখলেন—মনে হয় সত্ত্ব তাঁকে এত বুড়ো দেখাচ্ছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। শেষে একটা লম্বা নিষ্ঠাস ফেলে বললেন, “এই দেশের ভবিষ্যৎ অঙ্ককার। দেশটা আস্তে আস্তে ডুবে যাবে।”



বুশ্পু ঘাড় বাঁকা করে জিজ্ঞেস করল, “কিসে ভুবে যাবে?”

মামা উত্তর দেওয়ার আগেই বাবু তার চিপসের প্যাকেট থেকে এক খবলা চিপস মুখে দিয়ে বলল, “বন্যার পানিতে। তা-ই না মামা?”

মামা খুব তাছিল্যের ভঙ্গিতে বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “না। দেশ ভুবে যাবে শুণামিতে আর চুরি-ডাকাতিতে।”

বুশ্পু আবার ঘাড় বাঁকা করে বলল, “আপনাদের সময় দেশে তোর-গুণা ছিল না? শুধু ছোট ছোট মহাপুরুষেরা ছিল?”

মামা গলার স্বর মোটা করে অনেকটা বাংলা নাটকের নায়কদের মতো গলা করে বললেন, “আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মানুষ। আমাদের মতো দেশপ্রেম, ত্যাগ—”

বুশ্পু ঝট করে ঘুরে বলল, “আপনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?”

শামা আমতা-আমতা করে বললেন, “সেই সময় সবাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা।”

“কিন্তু আপনি কী ছিলেন? ট্রেনিং নিয়ে এসে যুদ্ধ করেছেন?”

“ইয়ে মানে—”

বাবু মুখে আরও এক খবলা চিপস পুরে দিয়ে কড়মড় করে থেতে থেতে বলল, “নিশ্চয় ছিলেন। দেখছ না মামার মিলিটারিদের মতো মোচ। তা-ই না মামা?”

মামা দুর্বলভাবে ফাথা নাড়লেন। বুশ্পু তখন সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কত নম্বর সেক্টরে ছিলেন?”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার কমান্ডার কে ছিল?”

বাবু জিজ্ঞেস করল, “আপনার মেশিনগান আছে মামা?”

জামশেদ মামার মুখ কালো হয়ে উঠল, চোখ লাল হয়ে উঠল। নাক মোটা করে হঠাত বাজাই একটা ধমক দিয়ে বললেন, “আমার সাথে ফাজলেমি? একেবারে কান ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেব।”

বুশ্পু হঠাত মরিয়া হয়ে বলল, “কিন্তু আপনি কি সত্যিই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?”

রাগে মামার চেহারা খারাপ হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, “ছিলাম।”

“সত্যি?”

মামা চিৎকার করে বললেন, “আমি কি মিথ্যা কথা বলছি? আমি কি তোদের সাথে মশকরা করব? তোদের মতো আমরা কি নীতিহীন মানুষ? পাজি আর বেয়াদপ? আমরা কি ফাজিল ইতর ছোটলোক?”

মামা খুব খারাপভাবে গালিগালাজ করতে লাগলেন। ভাগিয়স গাড়ি চলছে, নাহয় গাড়ি ঘিরে মানুষের ভিড় জমে যেত। মামার এরকম গালিগালাজ শুনে ঝুঁপ্পু এবং আমরা চুপ মেরে গেলাম।

জাফলং ভ্রগটা আমদের একেবারে ষাটি হল। আমরা রওনা দিয়েছি দেরি করে, পৌছাতে পৌছাতে অনেক দেরি হল। জায়গাটার সৌন্দর্যের অনেক বর্ণনা শুনেছি, কিন্তু গিয়ে দেখি শত শত ট্রাক পাথর তুলে আনছে, নদীতে নৌকার ভিড়, সেখানে হাজার হাজার মানুষ নদী থেকে ছেকে ছেকে বালু বের করছে। নদীতীরে ছোট ছোট দোকান, সেখানে আগল করে আনা জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে।

জামশেদ মামাকে দেখলাম আগল করে আনা জিনিসে খুব শখ, দোকান থেকে দোকান ঘুরে ঘুরে আফটার শেভ লোশান সাবান এইসব জিনিস খোজাখুঁজি করতে লাগলেন।

আমরা ফিরে যাওয়ার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছিলাম, কিন্তু জামশেদ মামার জন্যে খুব দেরি হল। যখন রওনা দিয়েছি তখন অঙ্ককার হয়ে গেছে। মাইক্রোবাসে আমরা চুপ করে বসে আছি, বাইরে অঙ্ককার, সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। মামা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন তাঁর সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। সামনে কিছু দোকানপাট দেখে সেখানে গাড়ি থামানো হল, মামার সাথে আমরাও নামলাম। মামা সিগারেট কিনলেন, আমি কিনলাম চিউয়িংগ্রাম, তখন একজন জিঞ্জেস করল, “তোমরা কি বেড়াতে এসেছ?”

আমরা মাথা নাড়লাম। মানুষটা বলল, “তোমারা কি রানি ইরাবতীর বেদি দেখেছ?”

“না।” ঝুঁপ্পু জিঞ্জেস করল, “কী আছে সেখানে?”

“নরবলি হত সেখানে।”

“নরবলি?” আমি শিউরে উঠে বললাম, “সর্বনাশ!”

জামশেদ মামা শুকনো গলায় বললেন, “কখন হত?”

“এই শতাব্দীতেও হয়েছে। খাসিয়া রানি ছিল ইরাবতী।”

“নরবলি দিত কেন?”

“রানির খেয়াল। অপরাধীদের শাস্তি দিত সেটাও বলে কেউ-কেউ।”

ঝুঁপ্পু বলল, “চলো জায়গাটা দেখে যাই।”

মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, “আজকে ঝাত হয়ে গেছে। না যাওয়াই ভালো। তার উপর কৃষ্ণপক্ষের ঝাত।”

“কেন?”

“জায়গাটা খারাপ। অন্ধকারে যাওয়া ঠিক না।”

বুম্পু কৌতুহলী মুখে বলল, “কী হয় গেলে?”

“তয় পাইঁ। অনেক নরবলি হয়েছে তো—কিছু-একটা আছে। বিশেষ করে মেয়েদের যাওয়া একেবারেই ঠিক না। রানি ইরাবতীর প্রেতাঞ্চা নাকি ঘুরে বেড়ায়।”

শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, দেখলাম জামশেদ মামাও কেমন জানি শিটিয়ে উঠলেন, শুকনো গলায় বললেন, “দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল বাসায় যেতে হবে।”

বুম্পু ঘাড় বাঁকা করে বলল, “আমি রানি ইরাবতীর বেদি না দেখে যাব নাঃ।”

আমি চমকে উঠে বললাম, “কী বলছ তুমি বুম্পু? এত রাতে?”

“রাতই তো ভালো।”

জামশেদ মামা দুর্বল গলায় একটা হংকার দিলেন, “বাসায় চল।”

বুম্পু ততক্ষণে মানুষটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রানি ইরাবতীর নরবলির বেদির খৌজ নিয়ে সেদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। আমি পিছুপিছু ছুটে গিয়ে বললাম, “কী পাগলামি করছ বুম্পু?”

বুম্পু মুখ শক্ত করে বলল, “আমি হচ্ছি কুদুদের চেয়ারপারসন—এইসব কুসংস্কার বিশ্বাস করি না। তোরা যেতে চাইলে আয় নাহয় আমি একলাই যাব।”

বাবু মুখ কাঁদোকাঁদো করে বলল, “যেও না বুম্পু।”

বুম্পু কারও কথা শুনল না, অন্ধকার পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। বাধ্য হয়ে আমরাও পিছুপিছু হাঁটতে থাকলাম। জামশেদ মামা কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছেন, নিচু গলায় গজগজ করছেন। আমি বললাম, “ভূত তো আর সত্যি নেই—এটা নিশ্চয়ই বানানো—”

“বানানো না হাতি! এরকম জিনিস কেউ বানিয়ে বলে?”

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, “তা হলে এটা কি সত্যি?”

“নিশ্চয়ই সত্যি। আমার ছোট ফুপু চুল খোলা রেখে বাঁশবাড়ে গিয়েছিল। তখন—”

বাবু কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, “এখন বলবেন না মামা, ভয় করছে।”

মামা চুপ করে গেলেন।

রানি ইরাবতীর বেদিটা একটা দেওয়ালে ঘেরা জায়গার ভিতরে। বাইরে বিশাল কিছু চ্যাপটা ধরনের পাথর সাজানো আছে, দেখে মনে হয় অনেক মানুষ সেখানে বসে থাকত। পিছনে পাথরের দেওয়াল উঁচু করে রাখা।

সামনে একটা সরু গেট, সেটার ভিতর দিয়ে ভিতরে ঢুকেছি। ভিতরে আবছা অঙ্ককার, সামনে অনেকটা জায়গা খালি একটা খোলা ঘাঠের মতো। তার সামনে একটা বড় গোলাকার পাথরের বেদি। এখানে নিষ্পয়ই মানুষকে এনে বলি দিত, জায়গাটা দেখেই আমার ভিতরে আতঙ্কের একটা শহীন বয়ে গেল।

বুম্পু বেদিটা স্পর্শ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাতে এক লাফে বেদিটার উপরে উঠে দাঁড়ায়। জামশেদ মামা ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, “এই বুম্বুর, ওখানে উঠেছিস কেন? নাম। নাম বলছি!”

বুম্পু বেদি থেকে নামল না। হেঁটে হেঁটে ঠিক মাঝখানে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আমরা আবছা অঙ্ককারে দেখতে পেলাম সে আকাশের দিকে মুখ করে তাকিয়েছে, তারপর হঠাতে মাথার ফিতা টান দিয়ে চুলগুলি খুলে দিল। জামশেদ মামা শুকনো গলায় বললেন, “চুল খুলছে কেন? চুল—”

আমার হঠাতে একধরনের ভয় হতে থাকে। আমি কাঁপা গলায় বললাম, “বুম্পু—এই বুম্পু!”

বুম্পু আমার কথার উত্তর দিল না। বাবু কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, “এই বুম্বুর আপু! কথা বল না কেন? আমার ভয় করছে।”

বুম্পু হঠাতে অমানুষিক একধরনের গলায় খিলখিল করে হেসে উঠে—আমরা সেই হাসি শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। জামশেদ মামা কাঁপতে কাঁপতে পকেট থেকে একটা ম্যাচ বের করে একটা কাঠি জ্বালানোর চেষ্টা করতেই বুম্পু চিলের মতো চিতকার করে বলল, “না। যবরদার!” তারপর বিজাতীয় একধরনের আঞ্চলিক সুরে কী যেন বলতে বলতে মামার দিকে এগিয়ে আসে। মামার কাছাকাছি এসে হঠাতে বুম্পু থেমে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, “রক্ত চাই।”

আমরা কোনো কথা বললাম না। বুম্পু আবার বলল, “রক্ত। রক্ত চাই। কতদিনের ত্রুণি আমার। দাও রক্ত দাও—”

বুম্পু তার চুল ছড়িয়ে বেদির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, “রক্ত। রক্ত।”

আমি শুকনো গলায় বললাম, “কে? তুমি কে?”

বুম্পু খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, “তুমি আমাকে চেন না? আমি রানি ইরাবতী।”

“ই-ই-ইরাবতী?”

“হ্যা। আমার ডাকে তোমরা এসেছ এখানে। আমার রক্ত চাই। রক্ত।”

আমি ভাঙা গলায় বললাম, “কার রক্ত?”

“তোমাদের মাঝে যে মিথ্যাবাদী তার রক্ত। আসো, কাছে আসো। আমি গলায় কামড় দিয়ে শিরা ছিঁড়ে নেব—”

বুম্পুর মুখ থেকে হঠাত রক্ত শৈবে নেবার শব্দ শোনা গেল, আমার সমস্ত শরীর জমে যায় আতঙ্কে। আমি তয়ে মাথা নেড়ে বললাম, আমি না। আমি না—আমি মিথ্যা কথা বলি নাই—”

“কে বলেছ?” বুম্পুর গলা দিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মেয়ের গলায় কে যেন চিৎকার করে উঠল, “কে বলেছে?”

জামশেদ মামা হঠাত বুপ করে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন। ডাঙা গলায় বললেন, “ক্ষমা চাই। ক্ষমা চাই রানি ইরাবতী। আমি মিথ্যা কথা বলেছি। আমি—”

“কী বলেছ তুমি?”

“আমি বলেছি আমি মুক্তিবাহিনী, আসলে—আসলে—”

বুম্পু হঠাত মুখ তুলে হিংস্র গলায় বলল, “আসলে কী?”

“আসলে আমি মুক্তিবাহিনী না। আমি ইউনিভার্সিটিতে ফ্লাস করেছি—”

বুম্পুর শরীরে রানি ইরাবতীর দেহ টানটান হয়ে দাঁড়াল। দুই হাত উপরে তুলে কী-একটা বলতে গিয়ে হঠাত থেমে গিয়ে একেবারে স্বাভাবিক গলায় বলল, “কুদুদের আটাশ নম্বর কুসংস্কার ভুল প্রমাণিত হল।”

আমি চমকে উঠে বললাম, “কী? কী বললে?”

বুম্পু এক লাফে বেদি থেকে নেমে বলল, “এখানে মেয়েরা এলে তার উপর রানির প্রেতাঞ্চার বশ হয় সেটা পুরোপুরি গুলপট্টি।”

আমি তখনও বুঝতে পারছিলাম না—কোনোমতে বললাম, “বুম্পু! তুমি ঠিক আছ?”

“ঠিক থাকব না কেন? আমাদের কুলে রানি ইরাবতী নাটক হয়েছিল, সেখান থেকে অ্যাকচিং করে দেখালাম। ভালো হয়েছে না? গোল্ড মেডেল পেয়েছিলাম আমি। বাসায় গিয়ে মনে করিস, দেখাব।”

জামশেদ মামা তখনও হাঁটু গেড়ে মুখ হাঁ করে বসে আছেন। বুম্পু তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, “উঠুন মামা—এই জায়গাটা যা নোংরা, দিনের বেলা এলে বুবেন। আপনার প্যান্ট ময়লা হয়ে যাবে।”

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই খবর পেলাম জামশেদ মামা ভোরের ট্রেনে ঢাকা চলে গেছেন। তাঁর নাকি খুব একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়েছে।

বুম্পুকে তার গোল্ড মেডেলটা দেখাতে বলেছি, সে শুধু ধানাইপানাই করে, দেখাতে চায় না। কারণটা কী কে জানে!



গ্রাউল

গ্রাউল তার আরামদায়ক চেয়ারটিতে গা ডুবিয়ে বসেছিল। হাতের উভেজক পানীয়ের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে সে নিচু গলায় ভাকল, “ক্রিটন!”

সামনের দেয়ালে চাপা একটি ঘরঘর শব্দ হচ্ছিল, শক্তিশালী পাম্প দিয়ে ক্রিটন-কম্পিউটারের প্রসেসরের ভিতর দিয়ে তাপপরিবাহী তরল পাঠানো হচ্ছে। দেয়ালে ইতস্তত কিছু বাতি জুলে এবং নিতে ওঠে এবং প্রায় সাথে সাথে ক্রিটন-কম্পিউটার তার আধাধাত্ত্বিক গলায় বলল, “আমাকে ভেকেছেন মহামান্য গ্রাউল?”

“হ্যা। আমার হিসেবটা একটু বের করো।”

গ্রাউল একজন বন্ধশিল্প ব্যবসায়ী—গ্রাউল গার্মেন্টস নামে তার পৃথিবীজোড়া ব্যাবসা। গত দুই বছরে তার ব্যাবসা বাড়াবাড়ি রকম ফুলেফুলে উঠেছে।

ক্রিটন কাছাকাছি একটা হলোগ্রাফিক স্ক্রীন খুলে সেখানে গ্রাউলের ব্যাবসার হিসেবপত্র দেখাতে শুরু করে। গ্রাউল এক নজর দেখে অধৈর্য হয়ে বলল, “আহ! এই হিসেব না, অন্যটা।”

“কিন্তু মহামান্য গ্রাউল, অন্য হিসাবটি অসত্য। সেটি রাষ্ট্রের আইনভঙ্গকারী প্রক্রিয়ায় তৈরি। সেটি—”

গ্রাউল তার আরামদায়ক চেয়ারে সোজা হয়ে বসে পাশের টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, “আমাকে তোমার নীতিকথা শোনাতে হবে না। আমি জানি আমি কী করছি।”

“মহামান্য গ্রাউল—” ক্রিটন-কম্পিউটার তার স্বভাবসূলভ শান্ত স্বরে বলল, “আপনি যদি এই অসত্য হিসেবটি ব্যবহার করেন তা হলে আইন

ভঙ্গ করার অপরাধে আপনার বিকল্পে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে।”

গ্রাউল মুখ খিচিয়ে অভ্যন্তর ঝুঁকপ্তে বলল, “তোমাকে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না। কী করলে আইন বক্ষ হয় এবং কী করলে আইন ভঙ্গ হয় সেটা আমি তোমার চাইতে ভালো করে জানি।”

“আপনি জানেন না মহামান্য গ্রাউল—”

“ব্যস!” গ্রাউল চিৎকার করে বলল, “অনেক হয়েছে। এবারে হিসেবটা বের করো।”

ক্রিটন বলল, “সেটই যদি আপনার আদেশ হয়ে থাকে তা হলে দেখুন।”

প্রায় সাথে সাথেই গ্রাউলের কাছাকাছি হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে তার বন্তব্যবসায়ের হিসেবটুকু বের হয়ে আসে। গ্রাউল গত বছরের লাভের অক্ষের সাথে আগামী বছরের সম্ভাব্য লাভটুকু যোগ করে বিশেষ পুলকিত হয়ে ওঠে। জিব দিয়ে মুখের ডিতরে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে গ্রাউল উৎফুল্ল গলায় বলল, “খারাপ না! কী বল ক্রিটন?”

“কিন্তু এটা অসত্য।”

“কোন জায়গাটা অসত্য?”

“এই যে আপনি আগামী বছরের সম্ভাব্য লাভ হিসেবে যে-পরিমাণটুকু দেখছেন সেটি সত্য নয়। দুই বিলিওন ট্রাউজার এবং শার্টের জন্যে নিম্নশ্রেণীর পলিমার ব্যবহার করা হয়েছে। ট্রাউজার এবং শার্ট তৈরি করার পর সেগুলি সংরক্ষণের সময় যে-উত্তাপ দেওয়া হয় সেই উত্তাপে সেগুলি অস্ত দশ শতাংশ ছোট হয়ে গেছে। কাপড়গুলি আনুমানিকভাবে দশ সেন্টিমিটার ছোট। মানুষ কখনোই তার আকৃতি থেকে পরিমাণে ছোট কাপড় পরিধান করে না।”

গ্রাউল হাহা করে হেসে বলল, “তুমি ঠিকই বলেছ ক্রিটন।”

“তা হলে আপনি কীভাবে এইসকল ট্রাউজার এবং শার্ট বিক্রি করার কথা ভাবছেন? সেগুলি দশ সেন্টিমিটার ছোট।”

“যারা কিনবে তারাও দশ সেন্টিমিটার ছোট হয়ে যাবে।”

ক্রিটন-কম্পিউটার নিচু এবং শান্ত গলায় বলল, “আপনি কী বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।”

“তুমি কি বিজ্ঞান এনজাইমের নাম শনেছ?”

ক্রিটন-কম্পিউটার এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে তার তথ্যকেন্দ্র পরীক্ষা করে বলল, “জানি মহামান্য গ্রাউল। এই এনজাইমটি মানুষের উচ্চতাসংক্রান্ত জিনটির একটি অপ্রতিরোধ্য বিচ্যুতি ঘটিয়ে দেয়।”

“হ্যাঁ।” প্রাউল খিকথিক করে হেসে বলল, “মানুষের শরীরে এই এনজাইম পরিমাণমতো প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাদের উচ্চতা রাতারাতি দশ সেণ্টিমিটার কমিয়ে আনা যায়।”

ক্রিটন-কম্পিউটার গভীর গলায় বলল, “মাহমান্য প্রাউল, এটি শুধু যে অন্যায়, আইন এবং নীতিবিরুদ্ধ তা-ই নয়, এটি মানুষের জন্যে বিপজ্জনক।”

প্রাউল আবার হাহ করে উচ্চস্বরে হেসে বলল, “ন্যায়-অন্যায় খুব আপেক্ষিক ব্যপার। আর বিপদের কথা বলছ, জীবনটাই তো বিপজ্জনক।”

“যদি ধরে নিই আপনার কোম্পানির ছেট হয়ে যাওয়া জামা-কাপড় বিক্রি করার জন্যে পৃথিবীর মানুষকে দশ সেণ্টিমিটার ছোট করা প্রয়োজন এবং সেজন্যে সবার শরীরের বিজানন এনজাইম দেকানো প্রয়োজন—”

“হ্যাঁ। তা হলে কী?”

“তা হলে আমার প্রশ্ন, আপনি সেটি কী করে করবেন? পৃথিবীর মানুষ কেন আপনাকে তাদের শরীরে বিজানন প্রবেশ করাতে দেবে?”

প্রাউল একটি চোখ ছেট করে তার পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, “তুমি কি ভাবছ ঢাকচোল পিটিয়ে হৈচৈ করে পৃথিবীর মানুষের শরীরে বিজানন এনজাইম প্রবেশ করানো হবে?”

“তা হলে?”

“কাজটি করা হবে গোপনে। তাদের অগোচরে।”

“অগোচরে?”

“হ্যাঁ।”

“মহামান্য প্রাউল—” ক্রিটন থমথমে গলায় বলল, “কাজটি ঘোরতর অন্যায়—আমি তবুও জানতে চাইছি সেটি কীভাবে করা হবে।”

প্রাউল উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে বলল, “নবম মাত্রার কম্পিউটার হিসেবে তুমি নেহায়েত সাদাসিধে ধরনের।”

“সম্ভবত।”

“তুমি নিশ্চয়ই জান সম্পত্তি আমি শীতল পানীয় ব্যাবসায় প্রবেশ করেছি। পৃথিবীর একটি অন্যতম জনপ্রিয় পানীয়-কোম্পানি কিনে নিয়েছি।”

“জানি মহামান্য প্রাউল। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সেটি একটি অল্লাভজনক বিনিয়োগ ছিল।”

“সাময়িকভাবে তা-ই মনে হতে পারে।” প্রাউল তার পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, “কিন্তু বিজানন এনজাইম শরীরে প্রবেশ করানোর জন্যে এর থেকে সহজ উপায় কী হতে পারে? আমার নিজের ফ্যাক্টরিতে পানীয়ের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে।”

“কিন্তু মহামান্য গ্রাউল—”

“কাঁচামাল রঞ্জনিকারককে কীভাবে ফাসানো হবে সেটিও ঠিক করে রাখা আছে। সেটা তোমাকে বলে লাভ নেই। তোমার হার্ডওয়ার অনেক উন্নত মানের হতে পারে, কিন্তু তুমি অপ্রচলিত কৌশল বোবা না—”

“শব্দটি সম্ভবত অন্যায় কিংবা নীতিবিরুদ্ধ।”

“একই কথা।”

“কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা কী?”

‘উদ্দেশ্য আদি এবং অকৃত্রিম টাকা। পৃথিবীটা কার? পৃথিবী টাকার।’
গ্রাউল যেন অত্যন্ত উচ্চমানের রসিকতা করেছে সেভাবে হেসে উঠল।

ক্রিটন-কম্পিউটার তার হাসি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিচু গলায় বলল, “কিন্তু আপনার তো অনেক টাকা!”

“আমার আরও চাই।”

“আরও কত চাই?”

“সেটা কি আর আগে থেকে বলা যায়? আরও অনেক চাই।”

ক্রিটন-কম্পিউটার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো শব্দ করল। তাকে মানুষের অনুকরণে কথা বলার জন্যে অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে।

গ্রাউল হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে তার বিশাল টাকার পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করতে করতে মুখ দিয়ে একটি আরামদায়ক শব্দ বের করল, টাকার অঙ্ক নাড়াচাড়া করতে তার খুব ভালো লাগে। খানিকক্ষণ সংখ্যাগুলি দেখে সে তার নরম চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার গা ডুবিয়ে বলল, “ক্রিটন!”

“বলুন মহামান্য গ্রাউল।”

“আমার সব টাকা দিয়ে হীরা কিনে রাখবে। এমনি টাকাকে বিশ্বাস নেই—তার দাম ওঠানামা করে। হীরা হচ্ছে নিরাপদ বিনিয়োগ।”

“কিন্ব মহামান্য গ্রাউল।”

“বড় বড় হীরা। কমপক্ষে একশো ক্যারটের সাইজ। বুঝেছঃ”

“বুঝেছি।”

“আমার জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় হীরাটি কিনে ফেলা।”

“সেটি কত বড়?”

“আমার সমান ওজন। সাউথ আফ্রিকার হীরকখনি থেকে বের হয়েছে, শ্বিথসনিয়ান মিউজিয়ামে আছে।”

“সেটি অসম্ভব মূল্যবান। আপনি এই মুহূর্তে সেটা কিনতে পারবেন না।”

“জানি। সেইজন্যেই আমার আরও অনেক টাকার দরকার। একজন মানুষ যখন দাবি করতে পারে সে তার শরীরের সমান ওজনের হীরা কিনতে পারে তখন বুঝতে হবে সেই মানুষটি সফল। আমি সফল মানুষ হতে চাই ক্রিটন।”

“সাফল্যের আরও অন্যরকম সংজ্ঞা আছে মহামান্য গ্রাউন্ড।”

“থাকুক। আমার সংজ্ঞা আমার কাছে। আমি আমার শরীরের সমান ওজনের হীরা কিনতে চাই। পৃথিবীকে দেখাতে চাই একজন মানুষ তার নিজের চেষ্টায় এত টাকা উপার্জন করতে পারে যে সে তার শরীরের সমান ওজনের হীরা কিনতে পারে।”

“মহামান্য গ্রাউন্ড!”

“বলো।”

“আপনার এই ধরনের শখ কেন হয়েছে?”

“ইতিহাস পড়ে। প্রাচীনকালে সম্মাটদের সম্মান দেখানোর জন্যে তাদের শরীরের সমান ওজনের সোনা উপহার দেওয়া হত। তারা সুদৃশ্য একটা দাঁড়িপাল্লার এক পাশে বসে থাকতেন, অন্য পাশে প্রজারা সোনা দিতে থাকত। যখন সোনার পরিমাণ তার ওজনের সমান হয়ে যেত তখন দাঁড়িপাল্লা তাকে উপরে তুলে আনত। প্রজারা তখন আনন্দধনি করত। একটা হাস্যকর পদ্ধতি—কিন্তু কার্যকর।”

“আপনিও সেই একই ব্যাপার করতে চান?”

“হ্যাঁ। তবে ব্রহ্মাল্যের সোনা দিয়ে নয়। হীরা দিয়ে।”

“যদি এটা করতে পারেন তা হলে আপনিও টাকা উপার্জন বন্ধ করবেন?”

গ্রাউন্ড হ্যাঁ করে হেসে বলল, “মনে হয় করব। একসময় তো থামতে হবে। কী বল?”

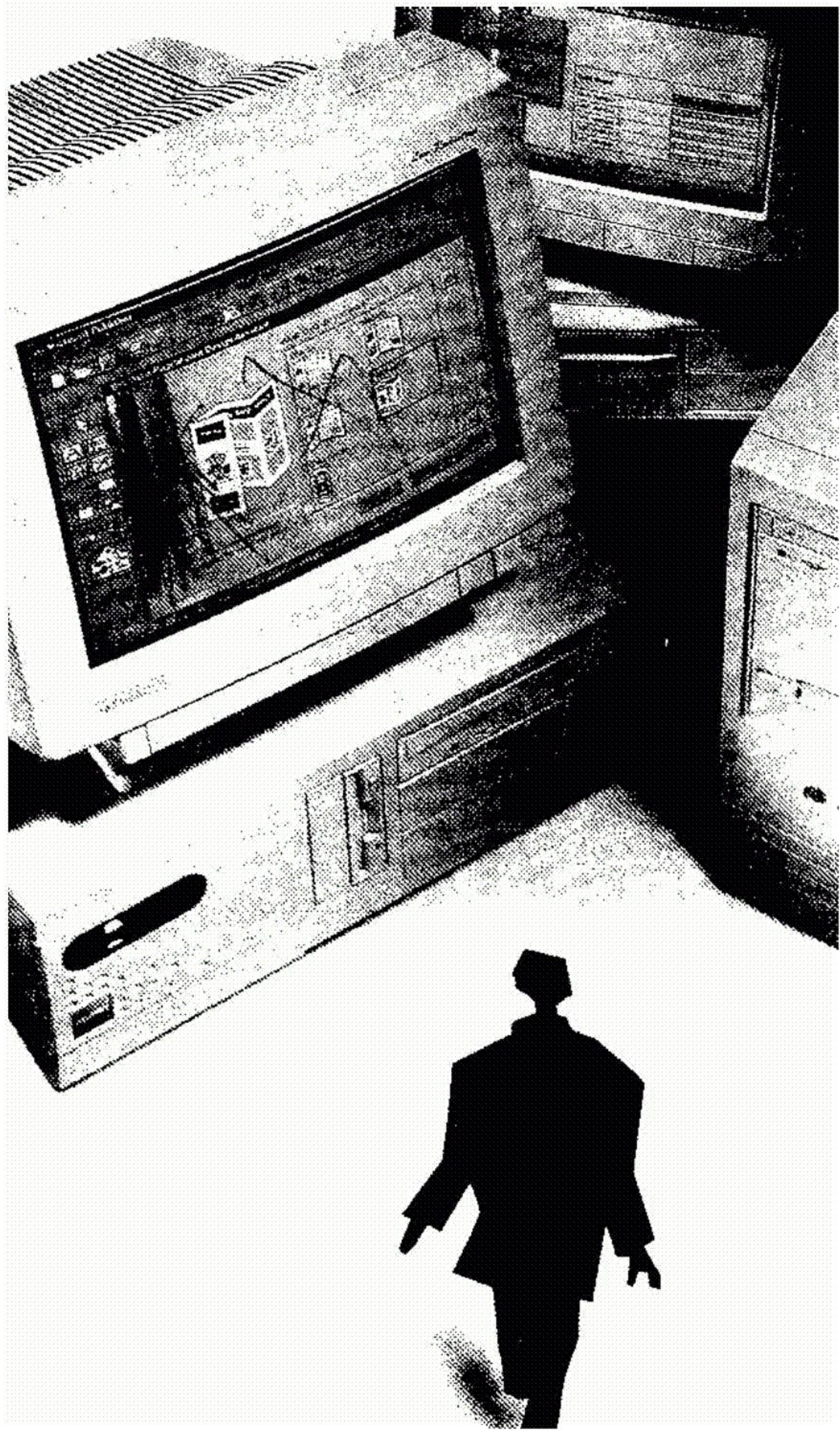
ক্রিটন কম্পিউটার কোনো কথা বলল না।

“কয়টা বাজে ক্রিটন?”

“অনেক রাত হয়েছে মহামান্য গ্রাউন্ড। এখন বাজে রাত বারোটা। আপনার সন্তুষ্ট শুয়ে পড়া উচিত।”

“হ্যাঁ, শুয়ে পড়ি।” গ্রাউন্ড তার নরম চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

বিশাল ধৰ্মধরে বিছানায় শুয়ে গ্রাউন্ড তার মাথার কাছে রাখা ক্রিস্টালের সুদৃশ্য গ্লাস হাতে নিয়ে পানীয়টাতে চুমুক দেয়। তার সুনিদ্রার জন্যে এই



পানীয়তে নানা ধরনের জৈব এবং অজৈব উপাদান দ্রবীভূত আছে। ক্রিটন-কম্পিউটার তার শরীরকে বিশ্লেষণ করে এই উপাদানগুলি ঠিক করে দেয়। মনে হয় এজন্যেই এই বয়সেও তার শরীর এরকম চমৎকার।

পানীয়টাতে ঝীজালো একধরনের গুঁক। এক চুমুক খেতেই সারা শরীরে আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে। প্রাউল ত্ত্বিতে একটা শব্দ করে আরেক চুমুকে পানীয়টা শেষ করে নেয়। প্রায় সাথে সাথেই তার চোখে মধুর একধরনের ঘুম নেমে আসে। চোখ বন্ধ করার আগে সে ক্রিটন-কম্পিউটারের গলার স্বর শুনতে পেল, “শুভ রাত্রি মহামান্য প্রাউল।”

“শুভরাত্রি।”

“আপনার আনন্দময় নিদ্রা হোক।”

প্রাউল উভয়ে কিছু বলার আগেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

ঘুম ভাঙ্গার পর চোখ খুলে প্রাউলের মনে হল কিছু-একটা ঠিক নেই। সে তার ধৰ্বধবে সাদা বিছানায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে কারুকার্যময় টেবিল, ঘরে পরিচিত আসবাব, সুদৃশ্য নকশাকাটা ছাদ, দেওয়ালে দুপ্রাপ্য তৈলচিত্র, কিন্তু তবুও কোথাও যেন কিছু-একটায় গোলমাল রয়েছে। ঠিক কী জিনিসটায় গোলমাল সে বুঝতে পারল না। ভালো করে চোখ খুলে তাকিয়ে মনে হল সবকিছু যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। প্রাউল প্রায় ধড়মড় করে উঠে বসল, হঠাতে করে মনে হল তার ধৰ্বধবে বিছানাটি খেলার মাঠের মতো বড়। মাথার কাছে টেবিলটি কাছে থেকেও অনেক দূরে, অনেক বিশাল। ঘরের ছাদ অনেক উঁচুতে, দুপ্রাপ্য তৈলচিত্রগুলি অনেক উঁচু থেকে ঝুলছে। কী হচ্ছে চারিদিকে?

প্রাউল ভয়-পাওয়া গলায় ডাকল, “ক্রিটন!”

দেওয়ালে কিছু বাতি জুলে উঠল এবং ক্রিটন-কম্পিউটার তার আধাযাত্তিক গলায় বলল, আমাকে ডেকেছেন মহামান প্রাউল?”

“কী হচ্ছে এখানে? সবকিছু এরকম মনে হচ্ছে কেন?”

“আপনি ছেট হয়ে গেছেন মহামান্য প্রাউল।”

“কী বললে?”

“আপনার পানীয়ের সাথে গতরাতে নয় মিলিগ্রাম বিজ্ঞান এনজাইম মিশিয়ে দিয়েছি। এই পরিমাণ এনজাইম আপনার দেহের আকৃতিকে কমিয়ে এক ফুটের কাছাকাছি নিয়ে আসবে।”

“কী বললে? কী—কী—”

“আপন’র জ’বনের উদ্দেশ্য সফল করে দিয়েছি মহামান্য ফ্রাউল। আপনার ওজন এখন মাত্র দেড় কেজি। আপনার অর্থ দিয়ে আপনি এখন আপনার সমান ওজনের একাধিক হীরা কিনতে পারবেন।”

ফ্রাউল নিজের দিকে তাকাল, সামনে আয়নাতেও সে নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সত্যি সত্যি সে ছোট হয়ে গেছে। একটা খেলনা-পুতুলের মতো। ভয়ংকর আতঙ্কে সে চিংকার করে ওঠে।

ক্রিটন-কম্পিউটার নিচু গলায় বলল, “মহামান্য ফ্রাউল, আপনার বর্তমান ওজনের কয়েকটি হীরা আছে। আপনি কোনটা কিনতে চান?”

ফ্রাউল আবার একটা চিংকার করে ওঠে। বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার পা পিছলে ঘায়, বিছানার নিচে পড়তে গিয়ে সে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বিছানার চাদর ধরে ঝুলে পড়ল। ফ্রাউল সেই অবস্থায় আতঙ্কে তার দুই পা ছুড়তে থাকে।

দেড় কেজি ওজনের একজন ন্যাংটা মানুষ বিছানার চাদর ধরে ঝুলছে—
দৃশ্যটি অত্যন্ত হাস্যকর। ক্রিটন কম্পিউটারের মাঝে হাসির অনুভূতি দেওয়া হয় নি বলে সে অবিশ্য সেটি ধরতে পারল না। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সে ফ্রাউলের জন্যে কিছু হীরা বাহতে শুধু করল।



শকসো

ঢাকা থেকে জরুরি কাজে সিলেট যাব, তাড়াহড়ো করে এয়ারপোর্টে এসে শুনি ফ্লাইটটা দুই ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়েছে। আমার মতো আরও অনেক যাত্রী বিরস মুখে বসে আছে—প্লেনের যাত্রীরা একটু ভদ্রগোচের বলে মনে হয়, না হলে এতগুলো মানুষকে এক কথায় দুই ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার পরও কোনো চ্যাচামেটি হৈচে নেই, বাগড়াঝাঁটি বাগ্বিতঙ্গ নেই।

এয়ারপোর্টের লাউজে বসে হাতের খবরের কাগজটা প্রায় মুখস্থ করে ফেললাম। কাগজের চতুর্থ এবং পঞ্চম পৃষ্ঠায় মফস্বলের অনেক খবর থাকে। মফস্বলে ভালো কিছু ঘটে বলে মনে হল না, বেশির ভাগই খুন-জখম এবং অ্যাসিড মারার গল্প, প্রথম এক-দুই লাইন পড়ে আর বিষ্ণারিত পড়ার ইচ্ছা করে না। কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দেখলাম আমার পাশে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বসে আছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই একটু হেসে জিজেস করলেন, “সিলেট যাচ্ছেন?”

“জি।”

“প্লেন কেন লেট হয়েছে জানেন?”

“না।”

“বিমানমন্ত্রী কলকাতা গিয়েছেন শাড়ি কিনতে।”

“শাড়ি কিনতে?”

“হ্যাঁ। শালীর বিয়ে।”

শাড়ি কেনার সাথে সিলেটে প্লেন লেট হবার সম্পর্ক কী আমি বুঝতে পারলাম না। জিজেস করলাম, “মন্ত্রী শাড়ি কিনলে আমাদের প্লেন লেট হবে কেন?”

“একটাই তো প্লেন। সেই প্লেন কলকাতা থেকে ফিরে আসবে, তারপর আমাদের নিয়ে সিলেট যাবে।”

আমি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললাম, “সত্যি বলছেন?”

“সত্যি। একেবারে পাকা খবর। ফ্লাইট ম্যানেজার আমার বিশেষ বন্ধুমানুব। সে খবর দিয়েছে। মন্ত্রীসাহেব তাঁর মিসেসকে নিয়ে বাজারে চলে গেছেন। ইন্ট্রাকশান দেওয়া আছে যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ প্লেনটাকে আটকে রাখতে হবে।”

আমি চোখ বড় বড় করে তাকালাম, ভদ্রলোক হাসিহাসি মুখ করে বললেন, “এত অবাক হচ্ছেন কেন? এরকমই তো চলছে। মোগল বাদশাহা যেরকম সারা দেশের সবকিছুর মালিক ছিল আমাদের মন্ত্রীরাও তা-ই। তারা সবকিছুর মালিক!”

আমি মাথা নেড়ে একটা নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসলাম। ভদ্রলোক চেয়ারে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সিলেটে নৃত্য যাচ্ছেন।’

“না। সেখানেই থাকি।”

“সুন্দর জায়গা! বিউটিফুল!”

কথা বলার জন্যে কথা বলা। তাই আমাকেও ভদ্রতা করে কিছু-একটা জিজ্ঞেস করতে হয়। জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি কোথায় থাকেন?”

‘বেশির ভাগ সময় ঢকাতেই থাকি। বাকি সময়টা চিটাগাং আর খুলনা। মাঝে মাঝে রাজশাহী সিলেট।’

“ও।” আরও কিছু জিজ্ঞেস করা যায় কি না ভাবছিলোম, তার মাঝে ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, “কী করেন আপনি?”

“আমি পড়াই। ইউনিভার্সিটিতে।”

“ও! ডেরি গুড়।” ভদ্রলোক এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করা একটা সাংঘাতিক কাও! আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি?”

“আমি? আমি এখন বিজনেস করি।”

“আগে অন্যকিছু করতেন?”

“হ্যাঁ। আগে ডাঙ্গার ছিলাম। সার্জন।”

“সার্জন?” আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, “সার্জারি ছেড়ে দিলেন কেন?”

ভদ্রলোক উত্তর না দিয়ে তাঁর ডান হাতটা আমার সামনে এনে মেলে ধরলেন, আমি দেখলাম তাঁর বুঢ়ো আঙুলটা নেই, কেউ যেন নিখুঁতভাবে কেটে নিয়েছে। আমি একটু হকচকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কোনো অ্যাকসিডেন্ট?”

“নাহ !”

“তা হলে ?”

“কেটে ফেলেছি !”

“কেটে ফেলেছেন ? কোনোরকম ইনফেকশান ?”

“উহঁ ! ইনফেকশান নয় । এমনিতেই কেটে ফেলেছি ।”

“এমনিতেই কেটে ফেলেছেন ? এমনি কেউ আঙুল কেটে ফেলে ?”

“তা ঠিকই বলেছেন, খামোকা কে আঙুল কেটে ফেলবে ? তাও বুড়ো আঙুল । সার্জনের বুড়ো আঙুল ! কারণ অবিশ্য একটা ছিল ।”

আমি একটু কৌতুহল নিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম । নিজে থেকে না বললে কারণটা জানতে চাওয়া ভদ্রতা হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না । ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, “আপনি যদি শুনতে চান তা হলে বলতে পারি । গল্লটা এখনও কেউ বিশ্বাস করে না—আপনি যদি না চান আপনাকেও বিশ্বাস করতে হবে না ।”

“কেন বিশ্বাস করব না ?”

“শুনলেই বুঝতে পারবেন । যা-ই হোক—” বলে ভদ্রলোক তাঁর বুড়ো আঙুলবিহীন হাতটা সামনে তুলে সেটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, “আমার নাম মাহবুব খন্দকার ।”

আমি নিজের নাম বলতেই তিনি করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আঙুলবিহীন হাত করমর্দন করতে আমার গা একটু কাঁটা দিয়ে উঠল, কেন ঠিক বুঝতে পারলাম না । ভদ্রলোক এতক্ষণ বেশ হাসিহাসি মুখেই বসে ছিলেন, এবারে গল্ল শুরু করার আগে হঠাতে কেমন জানি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন ।

গল্লটা ছিল এরকম । তাঁর ভাষাতেই বলা যাক ।

আমার জন্ম অষ্টোবছরের নয় তারিখ, সেটা হচ্ছে তুলারাশি । তুলারাশির মানুষেরা নাকি ভূত-প্রেত পরলোক এসব অলৌকিক জিনিসে উৎসাহী হয় । সেটা সত্যি কি না আমি জানি না, কিন্তু আমার আসলেই ভূত-প্রেত এসবে খুব উৎসাহ ছিল । কাউকে জিনে ধরেছে বা পরীতে বশ করেছে শুনলে আমি দেখতে ফেতাম, বকুদের সাথে বাজি ধরে পোড়োবাড়িতে রাত কাটিয়েছি, লাশকাটা-ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি । প্ল্যানচেট করেছি, চক্রে বসেছি, অমাবশ্যার রাতে শূশানে গিয়েছি, জিন বশ করার দোয়া-দরুণ পড়েছি, কিন্তু আমার কপালই হোক আর যা-ই হোক সত্যিকারের অলৌকিক কিছু কখনো দেখি নি । প্রায়-ভৌতিক অনেক কিছু আছে, কিন্তু সত্যিকারের ভৌতিক ব্যাপার যার ব্যাখ্যা নেই সেরকম কিছু একবারও দেখতে পেলাম না ।

মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হওয়ার পর ভূত-প্রেত কিংবা অলৌকিক জিনিসে আকর্ষণ খানিকটা করে এল। অ্যানাটমি ক্লাসে বেওয়ারিশ লাশ কাটাকুটি করে আর ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে খুন-জখম অ্যাকসিডেন্টে মানুষকে মারা যেতে দেখে দেখে মন খানিকটা কঠোর হয়ে গেছে। তখন ভূত-প্রেত আর জিন-পরীতে আকর্ষণ বেশি থাকতে পারে না। তবুও আকর্ষণ যে একেবারে চলে গেল তা নয়, অলৌকিক জিনিসের গন্ধ পেলে একবার টুঁ মেরে আসতাম।

মেডিক্যাল কলেজ শেষ করে বিলেত গেলাম, সেখান থেকে এফ. আর. সি. এস. ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছি। দেশে আমার তখন খুব রম্ভমা প্র্যাকচিস। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রায় কশাইয়ের মতো মানুষকে কেটে ফেলি, ব্যাংকে টাকা রাখার জায়গা নেই। কয়েকটা ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগ রয়েছে—দিনে দু-চারটে অপারেশন করতে হয়। একদিন গলব্রাহ্মার স্টোনের জন্যে একজন মহিলাকে কাটব, ভদ্রমহিলা হঠাতে কাতর হবলেন, “ডাক্তার সাহেব, আমাকে কেন কাটাকুটি করছেন? আমি তো বাঁচব না।”

আমি হাহা করে হেসে বললাম, “আমি কি এতই খারাপ সার্জন যে গলব্রাহ্মার স্টোন সরাতে গিয়ে আপনাকে মেরে ফেলব?”

“সেটা নয়।” ভদ্রমহিলা ফিসফিস করে বললেন, “আমার আসলে ক্যান্সার হয়েছে।”

“ক্যান্সার?” আমি ভুক্ত কুঁচকে বললাম, “আপনি কেমন করে জানেন?”

“আমাকে একজন বলেছে?

“যিনি বলেছেন তিনি কি ডাক্তার? বায়োপসি করেছে?”

“না।” ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, “তার কিছু করতে হয় না। এমনিতেই বলতে পারে।”

আমি খুব কষ্ট করে বিরক্তি গোপন করে বললাম, “যিনি আপনাকে এরকম একটা কথা বলেছেন তিনি খুব অন্যায় করেছেন। আমি আপনার পেট খুলছি—আপনাকে জানাব যে আপনার ক্যান্সার নেই।”

যাই হোক, অপারেশন টেবিলে পেট খুলে আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম। সত্যি সত্যি ক্যান্সার—ভিতরে পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েছে, আমাদের কিছু করার নেই। আমি আবার বন্ধ করে ফিরে এলাম, তিনদিন পর ভদ্রমহিলা মারা গেলেন, মারা যাবার আগে তাঁর কাছ থেকে আমি সেই মানুষটার ঠিকানা নিয়ে রাখলাম।

কয়দিন পর ঠিকানা খুঁজে খুঁজে আমি সেই মানুষটাকে খুঁজে বের করেছি। পুরানো ঢাকার এক ঘিঞ্জি অঙ্গগলিতে একটা ছোট অঙ্ককার মশলার দোকানে উবু হয়ে বসে মশলা বিক্রি করছে। আধ্যাত্মিক মানুষের যেরকম চেহারা হওয়ার কথা তার চেহারা মোটেও সেরকম নয়। শুকনো তোবড়ানো গাল, কোটরাগত চোখ, থুতনিতে ছাগলের মতো দাঢ়ি, মাথায় তেলচিটাচিটে টুপি, শুনে শুনে ময়লা নেট ক্যাশবাস্ত্রে রাখছে।

আমি পরিচয় দিয়ে বললাম, “আমি আপনার কাছে একটা কথা জানতে এসেছি।”

“রোগীর কথা জনতে এসেছেন? আমি কিন্তু শনি-রবিবার ছাড়া বলি না।”

আমি মাথা নেড়ে বললাম, “না, আমি রোগীর কথা জানতে আসি নাই। আপনি কেমন করে রোগীর কথা বলেন সেটা জানতে এসেছি।”

আমার কথা শুনে মানুষটা হঠাৎ মুখ শক্ত করে আমার দিকে ঝুক্ষ চোখে তাকাল। কঠোর গলায় বলল, “সেটা শুনে আপনি কী করবেন?”

“আমি জানতে চাই।”

“সব জিনিস সবাই জানতে পারে না। আপনি বাড়িতে যান।” বলে লোকটা আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে তার ঝরিদ্বারদের জন্যে জিরা ওজন করতে শুরু করল।

আমি অবিশ্য হাল ছেড়ে দিলাম না, লোকটার পিছনে একেবারে চিনেজোকের মতো লেগে রইলাম। কখনো কাকুতি-মিনতি, কখনো ভয়-ভীতি, কখনো মিষ্টি কথা, কখনো শক্ত কথা কিছুই বাকি রাখলাম না। শেষ পর্যন্ত যে-জিনিসটা কাজে দিল সেটা হচ্ছে নগদ টাকা। আমি একবারও চিন্তা করি নি টাকা দিয়ে মানুষটাকে নরম করা যাবে, তা হলে প্রথম সেটা দিয়েই শুরু করতাম।

লোকটাকে নগদ দুই হাজার টাকা দেওয়ার পর টাকাগুলো শুনে ক্যাশবাস্ত্রে রেখে বলল, “আমার পোষা শকসো আছে।”

“পোষা কী?”

“শকসো।”

“সেটা কী?”

“জিনের মতো কিন্তু জিন না। জিন তো আগনের তৈরি, এটা আগনের না। এইটা রক্তমাংসের। রক্ত খায়।”

“রক্ত খায়?”

“হ্যাঁ।”

“সেটা পায় কোনখানে?”

“শরীরের মাঝে থেকে চুষে নেয়।”

“কার শরীর থেকে?”

“আমার পোষা শকসো—আমার শরীর থেকে খায়।”

আমি গাঁজাখুরি গল্ল শুনে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। মানুষটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। দুই দুই হাজার টাকা একেবারে অকারণে পানিতে ফেলে দিয়েছি বলে আফসোস হতে লাগল। একটা নিষ্ঠাস ফেলে বললাম, “এই শকসো কী করে?”

“বেশি কিছু করতে পারে না। রোগ শোক হলে বলে দিতে পারে। ওষুধপত্র দেয় মাঝে মাঝে।”

“কেমন করে দেয়?”

“বলে দেয়।”

আমি অবাক হয়ে বললাম, “বলে দেয়? কেমন করে বলে?”

“এই তো আপনাকে আমি বেভাবে বলি।”

“তার মানে আপনি তাকে দেখতে পারেন।”

বুড়ো তার দাঢ়ি নেড়ে বলল, “না দেখলে কথা বলব কেমন করে?”

আমি মুখ শক্ত করে বললাম, “আমাকে দেখাতে পারেন?”

“নাহ।” বুড়ো মাথা নেড়ে বলল, “অন্য কেউ থাকলে বের হয় না।”

“কেন বের হয় না?”

“সবকিছুর একটা নিয়ম আছে না? মানুষের নিয়ম মানুষের শকসোর নিয়ম শকসোর।”

আমি হতাশ হয়ে বললাম, “তার মানে আমি কোনোদিন দেখতে পারব না?”

“পারবেন না কেন? আপনি দেখতে চাইলে আপনি শকসো পোষেন।”

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, “আমি পুরুতে পারব?”

বুড়ো মানুষটা তার কোটরাগত চোখে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “ইচ্ছা করলে মানুষ কী না পারে! তবে—”

“তবে কী?”

“শকসো পোষা কিন্তু কুক্তা-বিলাই পোষার মতো না।”

“বুঝতে পারছি।”

“বিপদ আছে।”

“বিপদ-আপদ আমার ভালোই লাগে।”



মানুষটা খুব শ্রেষ্ঠের ডান করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “তা হলে
তো ভালোই।”

তারপর তার ক্যাশবাস্ট্রের নিচে হাত ঢুকিয়ে একটা জীর্ণ কাগজ বের
করে আনল। এই প্রথমবার আমি লক্ষ করলাম তার ডান হাতটা পঙ্গু—
শুকনো এবং শক্তিহীন, শুধু হাতের বুড়ো আঙুলটি বড় এবং অতিকায়। শুধু
তা-ই নয়, দেখে মনে হল আঙুলটি যেন তার নিয়ন্ত্রণে নেই, হঠাৎ হঠাৎ
সেটি নড়ছে।

দুই হাজার টাকার বিনিময়ে আমি একটা জীর্ণ কাগজে লেখা একটি
মন্ত্র এবং সেই মন্ত্রপাঠের কিছু নিয়মাবলী নিয়ে ফিরে এলাম। ডান হাতের
বুড়ো আঙুলের নথে খানিকটা সরিষার তেল মাখিয়ে সেটার দিকে একদৃষ্টে
তাকিয়ে মন্ত্র পড়তে হবে। মন্ত্র পড়ার আরও কিছু নিয়ম-কানুন আছে,
গুরুত্বপূর্ণ খাবার খাওয়া যাবে না, কাঁচা রসুন খাওয়া যাবে না, পরিষ্কার
কাপড় পরে থাকতে হবে, অন্যকিছুতে মনোযোগ দেওয়া যাবে না, গুরু
করতে হবে ঘন্টাবার মধ্যরাত থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি। দীর্ঘ মন্ত্র, সেটা শুরু
হয়েছে এভাবে :

আচাতন, কুচাতন গিলাবালী মা
মাকাতালী রাখাতালি শুণতালি ফা

এর পরে আরও আঠারো লাইন। এটা কী ভাষায় লেখা, এর অর্থ কী কিছুই
জানি না তবুও আমি শুরু করে দিলাম। আমার স্ত্রী খুব বিরক্ত হল, কিন্তু
আমি যখন শুরু করে দিয়েছি এখন তো এর শেষ না দেখে ছাড়তে পারি
না। গভীর রাতে গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরে বারান্দায় বসে ডান
হাতের বুড়ো আঙুলে সরিষার তেল মাখিয়ে বিড়বিড় করে আচাতন কুচাতন
পড়তে থাকি। এইভাবে একদিন দুইদিন করে দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেল,
কিন্তু শকসোর দেখা নেই। আমি যখন মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছি যে
ধড়িবাজ মানুষটা আমাকে ঠকিয়ে দুই হাজার টাকা মেরে দিয়েছে, তখন
এক রাতে খুব বিচিত্র একটা ঘটনা ঘটল। নথের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড়
করে মন্ত্র পড়ছি, হঠাৎ মনে হল আমার বুড়ো আঙুলটা যেন একটু নড়ে
উঠল, মনে হল আঙুলটা যেন আমার নিজের না, যেন অন্য কারও। আমি
অবাক হয়ে দেখলাম নথের নিচে হঠাৎ করে কেমন যেন কালচে রং দেখা
যাচ্ছে, হঠাৎ করে ব্যথা পেয়ে কালশিটে পড়ে গেলে যেরকম হয় অনেকটা
সেরকম। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, মনে হল বুড়ো আঙুলের ভিতরে
কিছু-একটা নড়ছে, বিচিত্র একবরণের অনুভূতি। নথের মাঝে কালো রংটা
ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল এবং মনে হল তার পিছন থেকে জীবন্ত কিছু-

একটা নড়ছে। হালকা গোলাপি রঙের জিনিসটা নড়তে নড়তে স্পষ্ট হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেটা একটা প্রাণীর ঋপ নিতে থাকে। চেহরা দেখে মনে হয় অনেকটা মানুষের মতো, কিন্তু যেন পুরোপুরি মানুষ নয়। শুধু তা-ই নয়, আমার মনে হতে লাগল প্রাণীটা যেন আমার দিকে তৈরি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি হঠাতে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম, মন্ত্র পড়া বন্ধ করে লাফিয়ে উঠে হাত ঝাঁকাতে শুরু করলাম যেন অগভ এই প্রাণীটাকে ঝাঁকিয়ে হাত থেকে ফেলে দেওয়া যাবে। প্রায় সাথে সাথেই বুড়ো আঙুলের অসাড় হয়ে থাকা বিচ্ছি অনুভূতিটা কমে গিয়ে সেটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমি তাকিয়ে দেখি নথটাও স্বাভাবিক হয়ে এসছে, দেখে কে বলবে একটু আগে সেখানে বিচ্ছি জীবন্ত কিছু-একটা দেখা গেছে!

ব্যাপারটা কি আসলেই ঘটেছে নাকি এটা আমার মনের ভুল আমি সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না, কিন্তু এই মাঝরাত্রিতে কেন জানি সেটা আর পরীক্ষা করে দেখার সাহস হল না। সে-রাতে আমার ঘুম হল ছাড়া-ছাড়া ভাবে, মাঝরাতে হঠাতে ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে চিন্কার করে জেগে উঠলাম। পাশে আমার স্ত্রী শুয়েছিল, সে ভয় পেয়ে জেগে উঠে আমাকে ধরে বলল, “কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?”

আমি কোনোমতে নিজেকে সাধলে নিয়ে কাঁপা গলায় বললাম, “খুব ভয়ের একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম—”

“কী স্বপ্ন দেখেছে?”

ভয়ের স্বপ্ন দেখতে যেরকম ভয় হয় বলতে গেলে কিন্তু সেরকম হয় না—বরং সেটাকে কেমন জানি ছেলেমানুষি এবং হাস্যকর শোনাই। আমি তাই কিছু না বলে আবার ওয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে অবিশ্যি আমার কাছে গতরাতের পুরো ব্যাপারটাকেই ছেলেমানুষি আর হাস্যকর মনে হতে লাগল। নথের মাঝে একটা-কিছু দেখা নিশ্চয়ই চোখের ভুল ছিল। সেখানে সর্বের তেল মাখানোর জন্যে চকচক করছিল বলে হয়তো কোনোকিছুর প্রতিফলন পড়ছিল, মাঝরাত্রিতে উর্বর মন্তিক্ষের কল্পনায় সেটাকেই মনে হয়েছে বিদ্যুটে কোনো প্রাণী—মশলার দোকানের বুড়োর ভাবায়—শকসো! ব্যাপারটা খানিকক্ষণ চিন্তা করে আমি মন থেকে দূর করে দিলাম।

পরবর্তী কয়েকদিন আমি কাজকর্ম নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। শরীরটাও কেমন যেন ঠিক ভালো ছিল না, কড়া অ্যান্টিবায়োটিক খেলে যেমন অস্ত্র অস্ত্র লাগে সরাক্ষণই সেরকম লাগছিল। সমস্যাটা কোথায় ঠিক ধরতে পারছিলাম না, কিন্তু শুধু মনে হতে থাকে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে কিছু-

একটা হয়েছে। একদিন বেশ রাত করে বাসায় ফিরে এসেছি—আমার স্তৰী তার এক দূর সম্পর্কের বোনের বিষয়তে গেছে, বাসায় আমি একা। রাত্রিবেলা ঘুমানোর আগে আমার হঠাত নথের মাঝে ছবি দেখার কথা মনে পড়ল। আমি নথের দিকে তাকিয়ে অনেকটা অভ্যাসের বশেই আচাতন কুচাতন মন্ত্র পড়তে শুরু করে দিলাম এবং কী আশ্চর্য, সাথে সাথে হঠাত আমার বুঢ়ো আঙুলটা অসাড় হয়ে গেল, মনে হল ওটার ভিতরে কিছু নড়ছে এবং দেখতে দেখতে বুঢ়ো আঙুলের নখটা কালচে নীল রঙের হয়ে গেল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম, দেখতে পেলাম সেই কালচে নীল রঙের ভেতর থেকে একটা প্রাণীর চেহারা ভেসে আসছে, সেদিনের মতো এত অস্পষ্ট নয়, আজ এটি স্পষ্ট এবং এক কথায় ভয়াবহ।

নথের মাঝে ছোট একটি প্রাণী। কিন্তু সেটি স্পষ্ট, তার খুঁটিনাটি সব দেখা যাচ্ছে। প্রাণীটি মানুষের মতো, কিন্তু মানুষ নয়। এর উঁচু এবং আসমান কপাল, ভূরঙ্গীন কৃতকৃতে চোখ, স্থির দৃষ্টি, ছোট নাক, নাকের ঠিক নিচেই বিস্তৃত একটা মুখ। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মুখটা হাঁ করল এবং দেখতে পেলাম দাঁতহীন জিবহীন সরীসৃপের মতো লালচে পিছিল একটা মুখ। আমার সমস্ত শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল।

আমার ইচ্ছে করল আতঙ্কে চিৎকার করে ছুটে পালাই, কিন্তু একজন মানুষ নিজের বুঢ়ো আঙুল থেকে কেমন করে ছুটে পালাবে? আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম, বিড়বিড় করে নিজেকে বললাম, “ভুল দেখছি। আমি নিশ্চয়ই ভুল দেখছি। আমি যদি চোখ বন্ধ করি তা হলে চোখ খুলে দেব কিছু নেই।”

আমি খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে থেকে আবার চোখ খুললাম, ভয়ে ভয়ে আবার বুঢ়ো আঙুলের দিকে তাকালাম, দেখতে পেলাম কুৎসিত প্রাণীটা এখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি হতবুদ্ধি হয়ে প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, ঠিক তখন প্রাণীটা মাথা নাড়ল ডান থেকে বামে তারপর বাম থেকে ডানে। প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর দ্রুত। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে সে যদি মাথা নেড়ে না বোঝাতে চায় অনেকটা সেরকম। প্রাণীটা হঠাত মাথা নাড়া বন্ধ করে মুখ হাঁ করল, আমি আবার তার দাঁতহীন জিবহীন লালচে মুখগহ্বর দেখতে পেলাম। প্রাণীটা স্থিরচোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমার ভুলও হতে পারে কিন্তু মনে হল সেটি যেন ত্রুর ভঙ্গিতে হাসল। তারপর হঠাত করে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি দীর্ঘ সময় একাকী বসে রইলাম, লক্ষ করলাম আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

পৰদিন পুৱানো ঢাকায় সেই ঘিঞ্জি গলিতে গিয়ে বুড়ো মানুষটাকে খুঁজে বেର কৰলাম। মানুষটা আমাকে দেখে তার পান-খাওয়া দাঁত বের কৰে হাসার চেষ্টা কৰে বলল, “খবৰ ভালো?”

আমি ইতস্তত কৰে বললাম, “বুঝতে পাৰছি না।”

“শকসো কি এসেছে?”

“ইয়ে মানে নথেৰ মাঝে দেখলাম—”

লোকটা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “তার মানে এসেছে। সাবধানে থাকবেন এখন। উলটাপালটা কিছু হলে বিপদ হতে পাৰে।”

“বিপদ?”

“হ্যাঁ।” বুড়ো মানুষটা দাঁত বের কৰে আবাৰ হাসার ভঙ্গি কৰে বলল, “শকসো আপনাৰ শৰীৱে বাসা তৈৰি কৰছে। সেখানে থাকবে এখন থেকে। আপনাৰ রক্ষ খেয়ে বড় হবে। কাজেই ভালো কৰে থাবেন। মাছ গোশত আৱ পালংশাক।”

আমি হতবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, মানুষটা গলা নিচু কৰে বলল, “বেশি জানাজানি যেন না হয়। জানাজানি হলে অনেক সমস্যা।”

“কী সমস্যা?”

“লোকজন ভয় পায়। কাছে আসে না। আৱ লোকজনকে দোষ দেবেন কেমন কৰে,—ভয় পাওয়াৱাই তো কথা! প্ৰথম প্ৰথম আমাৱও ভয় লাগত।”

“এখন লাগে না?”

“না। অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনাৱও অভ্যাস হয়ে যাবে। তবে শকসোৱে একটু কন্ট্ৰোল রাখবেন। শৰীৱের ভিতৱে সব জায়গায় যেতে দিবেন না। আপনি টেৱ পাবেন শৰীৱের ভিতৱে দিয়ে যাচ্ছে, নড়ছে, আপনি কন্ট্ৰোল কৰবেন।”

লোকটাৰ কথা শুনে আমাৱ সমস্ত শৰীৱ গুলিয়ে এল। আমি হতচকিতেৰ মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মানুষটা আমাকে সাত্ত্বনা দিয়ে বলল, “ভয় পাবাৰ কিছু নেই। শকসো অনেক কাজে আসে। রোগশোক বালা মুসিবত বলতে পাৱে। তাৱ কিছু সিগনাল আছে। যেমন ধৰেন মাথা নাড়া—”

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, “যদি ভানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে তাৱ অৰ্থ কী?”

লোকটা চমকে আমাৱ দিকে তাকাল, বলল, “মাথা নেড়ে না কৰছে?”

“অনেকটা সেৱকম।”

“সর্বনাশ !”

“কেন ? কী হয়েছে ?” কথা বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল ।

“এইটার অর্থ খুব খারাপ । এইটার অর্থ কেউ-একজন মারা যাবে ।”

“কে মারা যাবে ?”

“শকসোকে ডাকার আগে আপনি যাকে ছুঁয়েছেন ।”

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম সেদিন বাসায় ফেরার আগে আমি শেষবার কাকে ছুয়েছি । ক্লিনিকে আমার কোনো-একজন রোগী ? কাগজ বুরো নেবার সময় কোনো-একজন নার্স ? ড্রাইভার ? সিগারেটের দোকানের কম্ববয়সী ছেলেটা ? আমি তেবে পেলাম না ।

বুড়ো মানুষটা গঙ্গীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, “শরীরের মাঝে শকসো রাখা খুব বড় কাজ । জন্ম মৃত্যু আল্লাহর হাতে কিন্তু শকসো থাকলে সে ইঙ্গিত দেয় । বড় কঠিন ইঙ্গিত । আপনার হাতে সেই ইঙ্গিত—এটা খুব বড় দায়িত্ব । সাবধানে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে—নইলে কিন্তু গোনাগার হবেন ।”

পুরানো ঢাকার ঘিঞ্জি গলিতে মশলার দোকানোর সেই বৃক্ষের কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি—বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে, শরীরের ভিতরে রক্ত খেয়ে ভিন্ন কোনো প্রাণী বেঁচে থাকলে তাকে কোনো-না-কোনোভাবে ধরা সম্ভব, টেস্টিউবে ভরে সেটাকে টিপেটুপে দেখা সম্ভব । নখের নিচে এসে কেউ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারবে না । আমি নিজের চোখে দেখলেও সেটা বিশ্বাস করব না ।

বাসায় এসেই অবিশ্যি আমার সেটা বিশ্বাস করতে হল । আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে—এইমাত্র তার থবর এসেছে । একটা এন.জি.ও.-তে ঢাকরি করত, ময়মনসিংহ যাচ্ছিল, উলটো দিক থেকে একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দিয়েছে । গাড়িতে চারজন ছিল—তিনজন সাথে সাথে মারা গেছে, চতুর্থজন হাসপাতালে এখানও সংজ্ঞাহীন । আমার বন্ধু তিনজনের একজন । আমার এখন মনে পড়েছে রাত্রিবেলা তার সাথে কথা বলে যাবার আগে পিঠে একটা ঝাবা দিয়ে এসেছিলাম—আমার হাতে তাকেই আমি শেষবার স্পর্শ করে এসেছিলাম । শকসো ঠিক ইঙ্গিতই দিয়েছে ।

ঘটনাটি আমাকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিল, শরীরের মাঝে বিদ্যুটে একটা প্রাণী বাস করছে, মানুষের জীবন নিয়ে ভবিষ্যত্বাণী করছে, সেটা নিয়ে আমার খুব-একটা মাঝাব্যথা হল না—কিন্তু হাট্টা কাট্টা প্রাণবন্ত একজন মানুষ যে একেবারে হঠাতে করে মারা যেতে পারে সেটা আমার জন্যে প্রহ্লণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ল ।

যাই হোক, তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, বুড়ো আঙুলে সেই অশ্রীরী প্রাণীর কথা আমি একরকম ভুলে গেছি, তখন একদিন ক্লিনিকে একটা রোগী এসেছে। কমবয়সী বাচ্চা, হৎপিণ্ডের ভাল্ল নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে, অত্যন্ত জটিল অপারেশান, আমাদের দেশে তখনও কেউ সেটা সাহস করে করছে না। অপারেশান করার আগের রাতে আমি তাকে দেখতে গিয়েছি, বিছনায় জ্ঞান মুখে শুয়ে আছে। আমি তার হাত স্পর্শ করলাম, হঠাতে কী মনে হল বিড়বড়ি করে সেই মন্ত্র পড়তে শুরু করলাম, আচাতন কুচাতন গিলাবালী মা ...

প্রায় সাথেই বুড়ো আঙুলে কুৎসিত সেই মাথাটা ফুটে উঠল। মাথাটি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে কয়েকবার উপরে-নিচে করল, কোনোকিছুতে সম্মতি জানাতে হলে আমরা যেভাবে মাথা নাড়ি। তারপর হঠাতে করে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ডাক্তার-মানুষ, আমার কুসংক্রান্ত থাকা ঠিক নয়, কিন্তু তখন আমি কীভাবে জানি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, যত কঠিনই হোক এই অপারেশান দিয়ে ছেলেটার প্রাণ বেঁচে যাবে।

পরদিন ছেলেটার সার্জারি হল—দীর্ঘ সার্জারি—প্রায় ছয় ঘণ্টার মতো লাগল। অপারেশন খিরেটার থেকে যখন বের হলাম আমরা এত ঝুঁত যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, কিন্তু সবাই খুব খুশি। চমৎকারভাবে সার্জারি শেষ হয়েছে, ছেলেটা বেঁচে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

সত্যিই ছেলেটা বেঁচে গেল। সঙ্গাহ দুয়েক পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে গেল। ঘটনাটায় আমার হয়তো খুশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি কেন জানি খুশি হতে পারলাম না। নিজেকে কেমন জানি একটা প্রতারক প্রতারক মনে হতে লাগল। যদি দেখতে পেতাম শকসোটা মাথা নেড়ে বলছে ছেলেটা বাঁচবে না, তা হলে কি আমি তার জন্যে এত শক্তি ব্যয় করতাম, নাকি দায়সারাভাবে কিছু-একটা করতাম?

ব্যাপারটা পরীক্ষা করার সুযোগ এসে গেল দুদিন পরেই। একজন রোগী অপারেশনের জন্যে অপেক্ষা করছে। জটিল অপারেশান, কিন্তু আমি আগে অনেক করেছি। সত্যি কথা বলতে কী, ঢাকা শহরে এই বিশেষ অপারেশনটির জন্যে আমার খানিকটা খ্যাতি আছে। ক্যাবিনে যখন কেউ নেই আমি রোগীটার হাত ধরে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তেই শরীরের ভিতরে একটা কম্পন অনুভব করলাম, যনে হল সত্যি সত্যি কিছু-একটা শরীরের ভিতরে নড়ছে, হাত বেয়ে সেটা আমার নখের তলায় হাজির হল। কুৎসিত প্রাণীটা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ডান থেকে বামে মাথা নাড়ল। শকসোটা মনে করে রোগীটা বাঁচবে না।

আমার কেন জানি রোখ চেপে গেল, মনেমনে ঠিক করলাম যেভাবেই হোক একে বাঁচাতেই হবে। আমি রোগীর যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যতটুকু সন্তুষ্ট হয়ে অপারেশন থিরোটারে নিয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন থেকে সার্জারি করছি, হাতে চাকু ধরামাত্রই নিজের ভিতরে কেমন জানি একটা আত্মবিশ্বাস অনুভব করি, আজকেও তার ব্যতিক্রম হল না। জুনিয়র ডাক্তাররা মোটামুটি প্রস্তুত করে সবে গেছে, আমি কাজ শুরু করেছি, হঠাৎ একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ঘটল, আমার মনে হল আমার বুড়ো আঙুলটা যেন জীবন্ত হয়ে গেছে—তার উপর যেন আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফোরসেপ দিয়ে ধরে যেই চাকু নামাতে যাই চাকুটা নড়ে যায়—কিছুতেই ঠিক জায়গায় বসাতে পারি না। জোর করে চেষ্টা করতেই হঠাৎ করে একটা বড় আর্টারি কেটে ফেললাম—গলগল করে রক্ত বের হয়ে এল। বলা যেতে পারে আমার জীবনে এর থেকে বড় দুঃসময় আর কখনো আসে নি।

আমি নিজে অপারেশন চালিয়ে যেতে পারলাম না, জুনিয়র ডাক্তাররা জোড়াতালি দিয়ে কোনোভাবে শেষ করল। আমি পুরোপুরি পরাজিত একজন মানুষের মতো ফিরে এলাম। রোগীটি যে তোর হবার আগেই মারা যাবে সে-ব্যাপারে আমার নিজের কোনো সন্দেহ ছিল না।

বাসায় এসে আমি অঙ্ককার বারান্দায় মুখ ঢেকে বসে আছি, তখন আমার স্ত্রী এসে আমার কাছে বসল। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে?”

আমি তখন খুব দুর্বল হয়ে আছি, পুরো ব্যাপারটা আমার উপরে এত ভয়ংকর চাপ সৃষ্টি করেছে যে সেটা আর নিজে নিজে সহ্য করতে পারছি না। আমি ঠিক করলাম আমার স্ত্রীকে সব খুলে বলতে হবে, কারও সাথে এই ভয়ংকর দুঃসন্ত্রনের যন্ত্রণাটা ভাগাভাগি করে নিতে হবে।

আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, “আমি তোমাকে আজ একটা কথা বলব। আমি ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকে অনেকদিন গোপন রেখেছি।”

আমার কথা শনে আমার স্ত্রী খুব অবাক হল না, নিচু গলায় বলল, “আমিও তোমাকে একটা কথা বলব যেটা আমি তোমার কাছ থেকে গোপন রেখেছি।”

আমি চমকে উঠে বললাম, “কী কথা?”

“আগে তোমারটা বলো।”

আমি কিছু-একটা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী শাস্ত চেথে বলল, “তুমি, আগে বলো। প্রীজ!”

আমি তখন একটা বড় নিষ্পাস নিয়ে তাকে আমার গত কয়েকদিনের কথা বলতে শুরু করলাম। কেমন করে ব্যাপারটা শুরু হল, কেমন করে

সত্যি সত্যি বুড়ো আঙুলের নিচে কদর্য একটা মুখ ভেসে আসতে শুরু করল, কেমন করে সেটা মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করল, কেমন করে আমাকে অপারেশান টেবিলে পুরোপুরি অকর্মণ্য করে তুলল, আমি কিছুই গোপন করলাম না।

সবকিছু শুনে আমার স্ত্রী হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, “তুমি এটা বিশ্বাস কর?”

আমি মাথা নেড়ে বললাম, “আমি বিশ্বাস করতে চাই না, কিন্তু তুমিই বলো আমি কেমন করে অবিশ্বাস করি?”

আমার স্ত্রী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “ভালোই হল।”

“কী ভালোই হল?”

“তুমি বলে দিতে পারবে আমি বাঁচব কি বাঁচব না।”

আমি চমকে উঠে বললাম, “কী বলছ তুমি?”

“আমি ঘূর অসুস্থ।”

“কী হয়েছে তোমার?”

“লিউকিমিয়া।”

আমি চমকে উঠে বললাম, “কী বলছ তুমি!”

“হ্যাঁ। আমি অনেকদিন থেকে পরীক্ষা করাচ্ছি। ব্লাড স্যাম্পল সিংগাপুর থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনা হয়েছে। পজিটিভ।”

“আমাকে—আমাকে—তুমি এতদিন বলনি কেন?”

আমার স্ত্রী হাসার চেষ্টা করে বলল, “এই তো বললাম। আগে থেকে বললে তুমি আগে থেকে দুশ্চিন্তা করতে।”

“কিন্তু, কিন্তু—”

“কিন্তু কী?”

আমি কিছু না বলে হতবাক হয়ে আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার স্ত্রী আমার গায়ে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলল, “তুমি জান এই লিউকিমিয়ার চিকিৎসা কী। কিমো থেরাপি। বড় কষ্ট এই চিকিৎসায় আমি জানি। যদি আমি বাঁচব না তা হলে এই কষ্টের ভিতর দিয়ে আমি যেতে চাই না। জীবনের শেষ কয়টা দিন আমি একটু শান্তিতে কাটাতে চাই।”

আমি বিশ্বারিত চোখে আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। সোজা হয়ে বসে বললাম, “কী বলছ তুমি এসব?”

“ঠিকই বলছি।” আমার স্ত্রী তার হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “নাও। আমাকে ধরো। ধরে তুমি তোমার আচাতন কুচাতন মন্ত্রটা বলো।”

“না।”

“তোমাকে বলতে হবে।”

“না, কিছুতেই না।” আমি চিৎকার করে বললাম, “কিছুতেই না। আমি এসব নিশ্চাস করি না।”

“আমি করি।” আমার স্ত্রী আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, “অবুৰ্বা হয়ে না। প্রীজ। বলো, আমি বাঁচব কি বাঁচব না।”

গল্লের ঠিক এই পর্যায়ে এয়ারপোর্টের পেজিং সিষ্টেমে ঘোষণা দেওয়া হল সিলেটগামী প্যাসেজাররা যেন ডিপারচার লাউঞ্জে এসে হাজির হয়। প্লেনটা এক্ষনি ছাড়বে। ডাঙ্কার মাহবুব খন্দকার গল্ল থামিয়ে উঠে দাঢ়ালেন। আমিও ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঢ়ালাম, জিজ্ঞেস করলাম, “তারপর?”

“তারপর দেখতেই পাচ্ছেন। ওয়াইফিকে একটু বুকিয়ে বাথরুমে গেলাম। হ্যাক স ছিল, যাঁচ যাঁচ করে বুড়ো আঙুলটা কেটে ফেললাম।”

আমি শিউরে উঠে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক ব্যাগটা হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। আমি পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, “আপনার স্ত্রী?”

“সে ভালো আছে। পারফেক্ট। ফিট অ্যাজ এ ফিডল। লিউকিমিয়ার চমৎকার চিকিৎসা বের হয়েছে।” ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে সহ্নদয় ভঙ্গিতে হ্যাসলেন।

আমি একটা নিশ্চাস ফেলে জিজ্ঞেস করলাম, “আমার একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে।”

“বলুন।”

“যখন আপনি বুড়ো আঙুলটা কাটলেন তখন শকসোটা কোথায় ছিল? কী হল সেটাৰ।”

ডাঙ্কার মাহবুব আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, “সেটা আরেক কাহিনী। বিমানমন্ত্রীর আরেক শালীর বিয়ে না হলে সেটা বলে শেষ করা যাবে না।”



ফ্রাণী

“ফ্রাণী কাহাকে বলে?” জলীল স্যার ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা উচ্চারণ করে ক্লাসের দিকে তাকালেন।

টিটু মনেমনে বলল, “উচ্চারণটা হচ্ছে প্রাণী। ফ্রাণী না।” কিন্তু মুখে কোনো শব্দ করল না। জলীল স্যারকে উচ্চারণ শেখালে বিপদ আছে।

স্যার এক পা এগিয়ে এসে বললেন, “বল ফ্রাণী কাহাকে বলে?”

এবারে আজমল হাত তুলল এবং সাথে সাথে জলীর স্যারের মুখ হাসিতে উন্নাসিত হল। আজমল হচ্ছে ক্লাসের অন্যতম ভালো ছেলে। তার চুল ছোট করে ছাঁটা থাকে, তেল দিয়ে পরিপাটি করে সেই ছোট ছোট চুল ভিজিয়ে আঁচড়ানো থাকে। তার শার্ট নিখুঁতভাবে প্যান্টের মাঝে গুঁজে দেওয়া থাকে, সব বই এবং খাতায় মলাট লাগানো থাকে। সে ছোটছুটি করে না, ঘারপিট করে না, ক্লাসে যেটা পড়ানো হবে সেটা তার আগে থেকে পড়া থাকে। স্যার কিংবা আপারা জিঞ্জেস করলে সে সবার আগে হাত তুলে তার উত্তর দেয়।

জলীল স্যার আজমলের দিকে তাকিয়ে গলায় মধু ঢেলে বললেন, “বল আজমল।”

আজমল দাঁড়িয়ে মুখস্থ বলার মতো বলল, “পৃথিবীর সকল কিছুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—জড়বস্তু এবং প্রাণী। পাথর ও বৃষ্টি জড়বস্তু। বিড়াল ও বটবৃক্ষ প্রাণী। জড়বস্তু নড়াচড়া করিতে পারে না এবং তাহাদের সংবেদনশীল স্মায় নাই। কিন্তু প্রাণী নড়াচড়া করিতে পারে, তাহাদের . . .”

টিটু তাদের জীববিজ্ঞান বই খুলে দেখল, আজমল একেবারে পুরো চ্যাপ্টার মুখস্থ করে এসেছে, দাঁড়ি-কমাসহ! পাঠ্যবইয়ের ভাষা কিছু বোঝা

যায় না, তার উপর আজমল যেভাবে বেলগাড়ির মতন গড়গড় করে মুখস্থ
বলে যাচ্ছে, কী বলছে তার কিছুই বোৰা গেল না, শুধু মুখস্থটা যে খুব
ভালো হয়েছে সেটা বোৰা গেল। জলীল স্যার তারে খুব খুশি হলেন, দাঁত
বের করে হেসে বললেন, “বেরি গুড়।”

চিটু দাঁতের ফাঁক দিয়ে নিষ্পাস নিয়ে মনেমনে বলল, “বেরি গুড় না—
তেরি গুড়।”

জলীল স্যার এবারে আজমলকে ছেড়ে বাকি ক্লাসের দিকে নজর দিলেন
এবং প্রায় সাথে সাথেই তাঁর মুখ থেকে হাসি সরে গিয়ে সেটা শক্ত হয়ে
গেল, দেখে মনে হতে লাগল স্যার বুঝি একক্লাস গোরু-ছাগলের দিকে
তাকিয়ে আছেন। নাক দিয়ে ফৌস করে একটা নিষ্পাস ফেলে বললেন,
“বুরেছিস ফ্রাণী কাহাকে বলে?”

ক্লাসের সবাই মাথা নাড়ল। প্রাণী হচ্ছে বইয়ের চোদ্দ পৃষ্ঠায় লেখা কিছু
কথা, বাসায় গিয়ে সেটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে, এর মাঝে না বোৰার কী
আছে? জলীল স্যারকে দেখে অবশ্য মনে হল তাঁর বুঝি পড়ানোর মুড়
এসেছে। মুখটা ছুঁচালো করে বললেন, “যারা বুঝিস নাই তারা মন দিয়ে
শোন। ফ্রাণী কী? জড় ফদার্থ এবং ফ্রাণীর মধ্যে ফার্থক্য কী?”

চিটু নিষ্পাস আটকে দাঁতের মাঝে দাঁত চেপে মনেমনে বলল, “ফদার্থ
না, পদার্থ। ফার্থক্য না, পার্থক্য।”

জলীল স্যার বলতে লাগলেন, “ফ্রাণীর ফ্রথম বৈশিষ্ট্য তাদের খেতে
হয়। তাদের নিষ্পাস নিতে হয়। তারা বর্জ্য ফদার্থ ত্যাগ করে। তাদের
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তারা লড়াচড়া করতে পারে। জড় ফদার্থ লড়াচড়া করে না,
শুধু জীবন্ত ফ্রাণী লড়াচড়া করে।”

চিটু এবারে হাত তুলল, বলল, “স্যার।”

সাথে সাথে জলীল স্যারের মুখ শক্ত হয়ে গেল, ক্লাসে খালি প্রশ্ন করে
বলে চিটুকে জলীল স্যার দুই চোখে দেখতে পারেন না। মুখ শক্ত করেই
বললেন, “কী?”

“স্যার, মোটরগাড়ি চালাতে পেট্রল লাগে, ইঞ্জিনে অঙ্গিজেন লাগে।
বর্জ্য হিসেবে কালো ধোয়া বের হয়। তা হলে কি মোটরগাড়ি একটা
প্রাণী?”

কথাটা চিটু মোটেই ঠাট্টা করে বলে নি, একটা ঘুড়ি দিয়ে বলেছে,
কিন্তু ক্লাসের সবাই হাহা করে হেসে উঠল। জলীল স্যার সেটাকে একটা
ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে ধরে নিলেন। স্যারের কালো মুখ আরও কালো
এবং খমখমে হয়ে উঠল। স্যার ফৌস করে একটা নিষ্পাস ফেলে এগিয়ে

এসে খপ করে টিটুর কান ধরে তাকে বেঞ্চ থেকে টেনে তুলে ফেললেন, মুখ ছঁচালো করে বললেন, “মাথায় এইটুকু বুদ্ধি? গাড়ি একটা ফ্রাণী?”

“না স্যার, কিন্তু আপীরা যা যা করতে পারে গাড়িও তো তা-ই করতে পারে।”

জলীল স্যার টিটুর কান ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, ‘ফ্রাণীদের আরও বৈশিষ্ট্য আছে গাধা কোথাকার! ফ্রাণীরা বড় হয় আর বাঢ়া ফয়দা করে।’

টিটু মনেমনে বলল, “ফয়দা না, পয়দা।” বাঢ়া পয়দা করা আর বড় হওয়া নিয়েও তার কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু জলীল স্যার যখন শক্ত হাতে কান ধরে রেখেছেন তখন সেটা নিয়ে কথা বলা বিপজ্জনক হতে পারে। কাজেই টিটু কানের যন্ত্রণাটা সহ্য করে চুপ করে রইল। স্যার আবার কানে ধরে একটা হ্যাঁচকা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে বললেন, “গাড়ি কি কখনো বড় হয়? দেখেছিস কখনো একটা টেস্পো বড় হয়ে ট্রাক হয়েছে? দেখেছিস?”

টিটু মাথা নেড়ে বলল যে সে দেখে নি।

“কখনো দেখেছিস একটা বাস একটা বেবিট্যাঙ্গি বাঢ়া দিয়েছে? দেখেছিস?”

টিটুকে স্বীকার করতেই হল যে সেটাও সে দেখে নি। জলীল স্যার এবারে যুদ্ধজয় করার ভঙ্গি করে আস্তে আস্তে ফ্লাসের সামনের দিকে চলে গেলেন। টিটু যখন দেখল তার থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে এবং আচমকা তাকে মেরে বসতে পারবেন না তখন আবার সাহস করে বলল, “স্যার!”

“আবার কী হল?”

“যদি কখনো দেখা যায় কোনোকিছু নড়তেচড়তে পারে, সেটাকে আবার থেকে শক্তি নিতে হয়, বর্জ্য পদাৰ্থ ত্যাগ করে, বড় হতে পারে, আবার নিজের মতো হৃবহু আরেকটা জিনিস তৈরি করতে পারে তা হলে কি সেটাকে আপনী বলা যাবে?”

জলীল স্যার চোখ ছোট ছোট করে টিটুর দিকে তাকিয়ে থেকে আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন তার ঘতলবটা কী, কোনো-একটা যুক্তি দিয়ে আবার তাকে বিপদে ফেলে দেবে কি না। যখন মনে হল এই মুহূর্তে সেরকম কিছু করতে পারবে না, তখন একটা নিষ্পাস ফেলে বললেন, “হ্যাঁ, বলা যাবে সেটা ফ্রাণী।”

টিটু সাথে সাথে বসে পড়ল দেখে জলীল স্যার নিশ্চিন্ত হলেন এবং গলা উঁচিয়ে বললেন, “ফড়াশোনার উদ্দেশ্য হল ভালো নম্বর পাওয়া। বইয়ে যা

আছে মুখস্ত করে হৃষ্ট লিখিবি, সেটা নিয়ে কখনো তর্ক করবি না। যারা বই
লিখিছে তারা কি না জেনেওনে বই লেখে?”

চিটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনেমনে বলল, “ফড়াশোনার উদ্দেশ্য নম্বৰ ফাওয়া
না—পড়াশোনার উদ্দেশ্য শেখা।” কিন্তু সেটা সে জোর গলায় বলতে পারল
না, এই ক্ষুলে কেউ এই কথা জোর দিয়ে বলতে পারে না।

পরের দিন বিজ্ঞান ক্লাসে জলীল স্যার এলেন না, দণ্ডরি দিয়ে একটা নোটিশ
পাঠালেন। নোটিশে লেখা জরুরি কাজে তিনি ক্লাসে আসতে পারছেন না,
সবাই যেন বিজ্ঞান বইয়ের উন্নতিশ পৃষ্ঠা থেকে সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠা মুখস্ত করে
ফেলে। আজমলের উপর নির্দেশ থাকল ক্লাসের উপর নজর রাখা, কেউ যদি
গোলমাল করে তা হলে তার নাম লিখে রাখা, স্যার পরের ক্লাসে তাদের
এমন ধোলাই দেবেন যে তারা তাদের বাবার নাম না হলেও মামা-চাচাদের
নাম ভুলে যাবে। সবাই যখন উন্নতিশ থেকে সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠা মুখস্ত করতে
লাগল তখন আজমল একটা কাগজ আর কলম নিয়ে টেবিলের কাছে
দাঁড়িয়ে রইল, কেউ একটু মুখ ঝুলিয়ে তার নাম উঠে যাবে। আজমল
এমনিতেই স্যারদের কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলে, এসব ব্যাপারে শুধু
অক্ষরে-অক্ষরে নয়, দাঁড়ি-কমাসহ মেনে চলে—কাজেই কেউ টুঁ শব্দ করার
সাহস পেল না।

জলীল স্যার কেন ক্লাসে এলেন না বোঝা গেল না, কিন্তু দেখা গেল
ক্ষুলের বাইরে একটা পিকআপ ট্রাক এসে থেমেছে, তার ডেতের থেকে
কার্ডবোর্ডের বড় বড় বাক্স নামানো হচ্ছে। জলীল স্যারকে দেখা গেল খুব
ব্যস্ততার ভাব করে হাঁটাহাঁটি করছেন। বাক্সগুলি যখন ধরাধরি করে নেওয়া
হচ্ছে তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে জলীল স্যার এমন ভাব করতে লাগলেন যেন
বাক্সগুলির ভিতরে ছোট ছোট অ্যাটমবোমা রয়েছে, একটু ধাক্কা লাগলেই
সেগুলি ফেটে যাবে।

প্রদিন বাক্সগুলির রহস্যভূদ হল। জলীল স্যার ক্লাসে এসে এমন ভাব
করতে লাগলেন যে মনে হল তাঁকে বুবি ভোট দিয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট করে
দিয়েছে—এক্ষুনি তাঁকে বঙ্গভবনে চলে যেতে হবে। মুখটা ছুঁচালো করে
ক্লাসের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় হাঁটতে হাঁটতে বললেন, “বিজ্ঞান
শিক্ষা কখনই ফুর্ণাঙ্গ হয় না যদি সেটা হাতে-কলমে করা না যায়। (চিটু
দাঁতে দাঁত ঘষে মনেমনে বলল, ফুর্ণাঙ্গ না, পূর্ণাঙ্গ!) এই আধুনিক যুগে
কম্পিউটারের শিক্ষা না দেওয়া হলে সেই শিক্ষা হবে অফর্যাঞ্জ (আবার দাঁতে

দাঁত ঘর্ষণ : অফর্যাণ্ট না—অপর্যাণ্ট!) কাজেই আমাদের স্কুলে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যে একটা এন. জি. ও. একটা কম্পিউটার দিয়েছে। কাজেই এখন থেকে তোমাদের কম্পিউটারে শিক্ষা দেওয়া হবে।”

ক্লাসের সব ছেলে আনন্দের মতো শব্দ করল এবং জলীল স্যার পর্যন্ত এই চ্যাচামেচি মাফ করে দিলেন।

আজমল হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, “স্যার, আপনি কি আমাদের কম্পিউটার শেখাবেন?”

স্যার ঠোঁট উলটিয়ে এমন ভাব করলেন যেন এই প্রশ্ন করে কেউ তাঁকে অপমান করে ফেলেছে। মুখটা বাঁকা করে বললেন, “আর কে আছে স্কুলে?”

স্কুলে আরও স্যারের আছেন, আপারা আছেন, তাঁদের অনেকে সত্যিকারের ভালো মানুষ, শুন্ধ বাংলাতেও কথা বলতে পারেন, কিন্তু কেউ আর সেটা স্যারকে মনে করিয়ে দিতে সাহস পেল না। চিটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কম্পিউটার চালাতে পারেন, স্যার?”

জলীল স্যারের মুখ তখন একটু কালো হয়ে গেল। স্যারের গায়ের রং এমনিতেই কালো, তাই যখন তাঁর মুখ কালো হয়ে যায় সেটা সহজে বোঝা যায় না, কিন্তু তখন তাঁর চোখ ছোট ছোট হয়ে যায়, নাক ফুলে যায়, ঠোঁট সরু হয়ে যায় এবং সেইসব দেখে আন্দাজ করতে হয়। স্যার ফোস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, “সেইটা কি তোর মাথাব্যথা নাকি স্কুল কমিটির মাথাব্যথা? এই স্কুলে কে কম্পিউটার চালাতে ফারে সেইটা স্কুল কমিটি জানে না?”

রাগের মুখে স্যার আরও গালাগালি করতেন, কিন্তু আজমল অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলল। স্যারদের তোষামোদ করায় সে একেবারে এক নম্বর, সবগুলি দাঁত বের করে বিগলিত হয়ে বলল, “আপনাকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই বিদেশে পাঠাবে। পাঠাবে না স্যার?”

জলীল স্যার মুখে একটা উদাস-উদাস ভাব করে বললেন, “ফাটানোই তো উচিত। এত বড় একটা ব্যাপার—দেশে কি ট্রেনিং দেওয়ার মতো কেউ আছে?”

চিটু মনেমনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কম্পিউটার চালানোকে জলীল স্যার পেন চালানোর মতো বড় একটা ব্যাপার মনে করছেন। চিটুর ছোট চাচা ঢাকা থাকেন, তাঁর দুই ছেলেমেয়ে বয়সে চিটুর থেকে ছোট, তারা ছোট চাচার কম্পিউটার ব্যবহার করে চিঠি লেখে, জন্মদিনের কার্ড তৈরি করে পাঠায়। কম্পিউটার চালানো যদি সত্যি কঠিন হত তা হলে এত ছোট ছোট বাচ্চারা সেটা কেমন করে করত? কম্পিউটার শেখার জন্যে যদি সত্যি

সত্য মানুষকে বিদেশ যেতে হয় তা হলে কে জানে দাঁত ব্রাশ করার জন্যেও বিদেশ যেতে হবে, বাথরুম করার জন্যেও বিদেশ যেতে হবে। বাথরুম করার জন্যে সবাই হড়োহড়ি করে প্রেনে উঠে বিদেশ যাচ্ছে দৃশ্যটা চিন্তা করে টিটুর হাসি পেয়ে গেল এবং মনে হয় সে একটু হেসেও ফেলল, কারণ হঠাতে করে সে শুনতে পেল জলীল স্যার বাজখাই গলায় ধমক দিয়ে জিজেস করছেন, “কী হল? হাসছিস কেন তুই গাধা কোথাকার?”

টিটু দুর্বল গলায় বলল, “না স্যার, হাসছি না।”

“খবরদার মিছা কথা বলবি না। স্ফট দেখলাম তুই হাসছিস। ফড়াশোনায় মন নাই কুসে হাসাহাসি! ফ্রাণী কাহাকে বলে মুখস্থ করেছিস?”

টিটু একেবারে বিপদে না পড়লে কিছু মুখস্থ করে না—জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করে, কিন্তু এখন সেটা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না, তাই সে মাথা নাড়ুল।

“তোর কি এখনও মনে হয় গাড়ি একটা ফ্রাণী?”

“না স্যার।”

“আর গাধা? গাধা কি একটা ফ্রাণী?

জলীল স্যার কী বলবেন কে জানে, টিটু কোনো ঝুঁকি নিল না, মাথা নেড়ে বলল গাধা একটি প্রাণী

“ছাগল?”

“ছাগলও প্রাণী।”

“তুই নিজে?”

টিটু দুর্বল গলায় বলল, “আমিও প্রাণী।”

জলীল স্যার এবার বক্তৃতা দেওয়ার মতো করে বললেন, “গাড়ি ফ্রাণী নয়, চক-ডাটার ফ্রাণী নয়, চেয়ার-টেবিলও ফ্রাণী নয়। কিন্তু গাধা একটি ফ্রাণী, ছাগল একটি ফ্রাণী এবং আমাদের টিটুও একটা ফ্রাণী।”

কথা শেষ করে স্যার ভাস করলেন তিনি খুব উচ্ছবের একটা রসিকতা করেছেন এবং জোরে জোরে হাহা করে হাসতে লাগলেন। স্যারের দেখাদেখি তখন অন্যেরাও জোরে জোরে হাসতে লাগল। টিটুর তখন এত মেজাজ খারাপ হল যে সেটি আর বলার মতো নয়।

কম্পিউটারের ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে জলীল স্যারকে অবিশ্য বিদেশে পাঠানো হল না। কাছাকাছি এক এন. জি. ও. অফিস থেকে চালবাজ ধরনের একজন



মানুষকে ক্ষুলে পাঠানো হল। ক্ষুলের ল্যাবরেটরি-ঘরে কম্পিউটারটি বসানো হয়েছে, সেখানে মানুষটি স্যারকে কম্পিউটারের উপর ট্রেনিং দিতে শুরু করেছে। জলীল স্যারকে কয়েকদিনের মাঝেই কেমন যেন বিধ্বন্ত দেখাতে লাগল, কম্পিউটারের সামনে শুকনো মুখে বসে থাকেন এবং ট্রেনিং দেওয়ার নাম করে চালবাজ লোকটা তাঁকে গালাগাল করে। ল্যাবরেটরি-ঘরের কাছাকাছি গিয়ে একদিন টিটু স্পষ্ট শুনতে পেল চালবাজ লোকটা বলছে, “কী ব্যাপার? এই সোজা জিনিসটা বোঝেন না? আপনার মাথায় কি গোবর ঠাসা আছে?”

এরকম সময়ে ঢাকা থেকে ছোট চাচা অফিসের কাজে টিটুদের বাসায় বেড়াতে এলেন। এমনিতে ছোট চাচা খুব ব্যস্ত মানুষ, সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করে সক্রিয়ে বাসায় ফিরে আসেন, কিন্তু বাসায় ফিরে এসেও প্রায় সারারাত হৈচৈ করে গল্পগুজব করেন। প্রথম দিনেই টিটু ছোট চাচাকে জিজেস করল, “ছোট চাচা, কম্পিউটার চালানো শেখা কি খুব কঠিন?”

“কম্পিউটার কি সাইকেল নাকি যে চালানো শিখবে? কম্পিউটার হচ্ছে একটা টুল, এটা ব্যবহার করবে।”

টিটু একটু লজ্জা পেয়ে বলল, “ঠিক আছে, তা হলে বলো কম্পিউটার ব্যবহার করা কি কঠিন?”

ছোট চাচা হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো একটা ভঙ্গি করে বললেন, “ধুর! টুকটুক কাজের জন্যে কম্পিউটার ব্যবহার করা কান চুলকানোর মতো সোজা। বিলু আর সানি করছে না?”

বিলু আর সানি ছোট চাচার হেলেমেয়ের নাম। টিটু মাথা নেড়ে বলল, “কম্পিউটার ব্যবহার করা শিখতে কয়দিন লাগে ছোট চাচা?”

ছোট চাচা চোখ ছোট ছোট করে বললেন, “শিখবি?”

“কেমন করে শিখব? কম্পিউটার পাব কোথায়?”

ছোট চাচা রহস্যের মতো ভঙ্গি করে তাঁর অ্যাটাচি কেস খুলে বড় একটা বইঘেরের মতো কী-একটা বের করে সেটাকে খুলে ফেললেন, টিটু অবাক হয়ে দেখল একটা আন্ত কম্পিউটার! ছোট চাচা সুইচ টিপে সেটা অন করে দিয়ে বললেন, “এটার নাম ল্যাপ টপ—কোলের উপরে থাকে তো! অফিসের কাজকর্ম করার জন্যে সাথে রাখতে হয়।”

“এটার কত দাম ছোট চাচা?”

“দামের কথা জিজেস করবি না—শুনলে হার্টফেল হয়ে যাবে। এই দ্যাখ—”

ছোট চাচা দাম শুনলে হার্টফেল হয়ে যাবে অথচ দেখে মনে হয় একটা খেলনা সেই কম্পিউটার দিয়ে টিটুকে শেখানো শুরু করলেন। আমা এসে দেখে বললেন, “কী করছ? ভুল জিনিস টেপাটেপি করে নষ্ট করে ফেলবে।”

ছোট চাচা মাথা নেড়ে বললেন, “ভুল জিনিস টেপাটেপি করে কেউ কম্পিউটার নষ্ট করতে পারে না।”

“তাই বলে এত দামি জিনিস বাচ্চাকে খেলতে দিছ?”

ছোট চাচা হেসে বললেন, “আমি খেলতে দিছি না ভাবি। টিটুকে শেখাচ্ছি।”

আমা চোখ কপালে তুলে বললেন, “এই অল্প বয়সে কী শিখবে? বড় হোক।”

“বড় হলে তো শিখবেই। এখনই শুরু করুক। কম্পিউটার এমন একটা জিনিস যেটা বড়দের থেকে ছোটরা ভালো বোঝে।”

ছোট চাচার কথা যে সত্যি সেটার প্রমাণ পাওয়া গেল। ছোট চাচা পাঁচদিন ছিলেন, তার মাঝেই টিটু মোটামুটিভাবে কম্পিউটার ব্যবহার করা শিখে গেল। কীভাবে কী করতে হয় সেটা একবার ধরে নেওয়ার পর দেখা গেল পুরো ব্যাপারটাই আসলে খুব সহজ। ছোট চাচা চলে যাবার আগে কিছু-কিছু ছোটখাটো মজার প্রোগ্রাম টিটুকে কপি করে দিচ্ছিলেন—তাদের ক্ষেত্রে কম্পিউটারে সুযোগ পেলে চালিয়ে দেখতে পারবে।

বসে বসে প্রোগ্রামগুলি কপি করার সময় টিটু একটা ফুপি ডিঙ্ক কম্পিউটারে ঢোকাচ্ছে, হঠাৎ ছোট চাচা হাহা করে চিৎকার করে উঠলেন, “ওটা তুকাস না। সর্বনাশ!”

টিটু একটু ধূমত খেয়ে গেল, “কেন ছোট চাচা?”

“এই ডিঙ্কটাতে খুব খারাপ একটা ভাইরাস আছে। এখানে ভুলে চলে এসেছে। সরিয়ে রাখ।”

টিটু ডিঙ্কটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে বলল, “ভাইরাস?”

“হ্যা। ফাইল প্রোগ্রামেরা একধরনের প্রোগ্রাম তৈরি করে, সেগুলি এমনিতে দেখা যয় না—গোপনে কম্পিউটারের মেমোরিতে হাজির হয়, তারপর সর্বনাশ করে ফেলে।”

“তার মানে—তার মানে—” টিটু তোতলাতে তোতলাতে বলল, “সত্যিকার জীবাণুর মতো?”

“সত্যিকার জীবাণু থেকেও খারাপ! এই ডিঙ্কেটে যে-ভাইরাসটা আছে সেটা নাকি তৈরি হয়েছে ইষ্ট ইউরোপে—তৈরি করেছে আঠারো-উনিশ বছরের কয়টা ছেলে। ভাইরাসটার নাম দিয়েছে হাংগে ডেভিল—ফুর্ধার্ট

শয়তান। মেমোরি রেসিডেন্ট হয়ে নিজেকে কপি করা শুরু করে কিছুক্ষণের মাঝে হার্ড ড্রাইভ ভরতি করে ফেলে! তারপর—”

“ছোট চাচা!” টিটু উত্তেজিত হয়ে বলে, “তার মানে এটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে, এটা বড় হতে পারে—এটা হ্রস্ব নিজের মতো আরেকটা তৈরি করতে পারে—”

“হ্যা। তা তো পারেই।”

“এটাকে কি কিছু খেতে হয়?”

ছোট চাচা হেসে বললেন, “খাওয়ার অর্থ কী? শক্তি গ্রহণ। সেই অর্থে এটাকেও খেতে হয়, কম্পিউটারের শক্তি থেকেই এটা শক্তি নেয়। এই ভাইরাসটা যখন নিজেকে কপি করে তখন তার জন্যে ইলেকট্রনিক্স থরচ হয় না? সেটাই তার খাবার।”

“বর্জ্য পদার্থ?”

“বর্জ্য?” ছোট চাচা অবাক হয়ে বললেন, “বর্জ্য মানে কী?”

“ওহ! ছোট চাচা তুমি দেখি কিছুই জান না! প্রাণীদের পেশা-পায়খানাকে ভদ্র ভাষায় বলে বর্জ্য পদার্থ। এই ভাইরাসটার কি কোনো বর্জ্য পদার্থ আছে?”

ছোট চাচা মাথা চুলকে বললেন, “সেটা তো নিশ্চয়ই আছে। মেমোরির এক লোকেশন থেকে যখন অন্য লোকেশনে যায় তখন আগের লোকেশনে যে-ডাটা থাকে—”

ছোট চাচা কী বলছেন টিটু সেটা কিছু বুঝতে না পারলেও বর্জ্য পদার্থ যে আছে সেটা বুঝে গেল। সে হাতে কিল দিয়ে বলল, “তার মানে এটা একটা সত্যিকারের প্রাণী!”

“সত্যিকারের প্রাণী?”

“হ্যা। আমাদের বইয়ে প্রাণীর যে-সংজ্ঞা দেওয়া আছে তার সব কয়টি মিলে যাচ্ছে!”

ছোট চাচা অবাক হয়ে টিটুর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তার উত্তেজনার ঠিক কারণটা ধরতে পারলেন না। একটু অবাক হয়ে বললেন, “তোর বইয়ের সংজ্ঞাটা বদলাতে হবে—কারণ এটা প্রাণী না—এটা একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম!”

টিটু উজ্জ্বল চোখে বলল, “আমি তো সেইটাই বলছি!”

ছোট চাচা হাল ছেড়ে দেওয়ার ভাব করে ভললেন, “ঠিক আছে বাবা—তুই কী বলছিস তুইই জানিস।”

টিটু একটা নিশ্চাস ফেলে বলল, “ছোট চাচা!”

“কী হল?”

“আমাকে এই হাঁগি ডেভিল ভাইরাসটা দিতে পারবে?”

“কী করবি?”

“আমার এক স্যারকে দেখাব।”

“ঠিক আছে, নিয়ে যা। তবে মনে রাখিস ভাইরাসটা খারাপ—পুরো সিটেম আবার নৃতন করে গোড় করতে হতে পারে।”

টেবিলের উপরে কম্পিউটারটা রাখা, সব ছাত্র সেটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। জলীল স্যার কম্পিউটারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, বায শিকার করে শিকারি ছবি তোলার জন্যে বায়ের উপর বেভাবে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর ভঙ্গিটা অনেকটা সেরকম। জলীল স্যার গাঁষ্ঠীর মুখে বললেন, “আজকে তোমাদের ফ্রথম কম্পিউটার ক্লাস। কম্পিউটার কীভাবে চালাতে হয় আমি তোমাদেরকে সেটা দেখাব—তোমরা দেখবে।”

সবাই চূপ করে রইল, শুধু আজমল বলল, “জি স্যার দেখব।”

“কম্পিউটার দিয়ে কী কী করা যায় তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আমি আরেকবার বলি—”

টিটু এই সময়ে হাত তুলে বলল, “স্যার!”

“কী হল?”

“আমাদের ক্লাসে কম্পিউটার শেখানো হবে শুনে আমার ছোট চাচা একটা চিঠি দিয়েছেন।”

“চিঠি? কোথায়?”

“এই যে স্যার। কম্পিউটার দিয়ে লিখেছেন। ডিস্কেট।”

টিটু পকেট থেকে একটা ডিস্কেট বের করে দিল। স্যার সেটা দেখে মুখে একটা সবজান্তা গঁষ্ঠীর ভাব ফুটিয়ে তুললেন। তিনি ডিস্কেটটা হাতে নিয়ে গঁষ্ঠীর হয়ে সেটা কম্পিউটারে ঢোকালেন এবং বেশ খানিকটা চেষ্টাচরিত্র করে ছোট চাচার লেখা চিঠিটা কপি করলেন। ছোট চাচা বলেছেন হাঁগি ডেভিল ভাইরাসটা তা হলেই কপি হয়ে যাবে। তার মিনিট দশকের মাঝেই কম্পিউটারের বাবোটা বেজে যাবার কথা।

স্যার টিটুকে ডিস্কেটটা ফেরত দেওয়ার সময় টিটু জিজেস করল,
“স্যার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম কি প্রাণী?”

“কী বললি?”

“কম্পিউটার প্রোগ্রাম কি প্রাণী?”

স্যার এবারে মুখ খিচিয়ে একটা ধমক দিলেন। “আমার সাথে মশকরা? কম্পিউটার প্রোগ্রাম ফ্রাণী হবে কেন?”

“আপনি বলেছিলেন যেটা নড়াচড়া করতে পারে, যেটা বড় হয়, যেটা বাঢ়া দেয়, যেটা খাওয়াদাওয়া করে, যেটা পেশাব-পায়খানা করে সেইটাই প্রাণী।”

“কম্পিউটার প্রোগ্রাম সেটা করে?”

“করে স্যার। ছোট চাচার চিঠির সাথে সেরকম একটা প্রোগ্রাম কম্পিউটারের মেমোরিতে গিয়েছে। সেইটা এখন খাওয়াদাওয়া করছে। পেশাব-পায়খানা করছে। বাঢ়াকাঢ়া দিল্লে।”

জলীল স্যার মুখ হাঁ করে টিটুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে ঠাট্টা করছে না সত্যি কথা বলছে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। কিছু-একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। টিটু বলল, “আমার কথা বিশ্বাস না করলে আপনি দেখেন স্যার হার্ড ডিস্কটা ভরে যাচ্ছে।”

জলীল স্যার একবার কম্পিউটারের কাছে গিয়ে কীবোর্ডটা ছুঁয়ে আবার চোখ লাল করে টিটুর দিকে তাকালেন, কী করে হার্ড ডিস্ক দেখতে হয় তিনি ভুলে গেছেন। টিটু বলল, “আপনি না দেখলেও ক্ষতি নাই। কিছুক্ষণ পর যখন পুরো হার্ড ডিস্ক প্রোগ্রামের ছানাপোনা আর বর্জ্য পদার্থ দিয়ে ভরতি হয়ে যাবে তখন কম্পিউটার এমনিতেই বন্ধ হবে যাবে।”

টিটুর কথা শেষ হবার আগেই কম্পিউটার থেকে একটা বিচ্ছি শব্দ হল এবং হঠাৎ করে মনিটরে ইংরেজিতে একটা লেখা ভেসে উঠল, “আমি ক্ষুধার্ত! আমাকে খাবার দাও!”

সবাই অবাক হয়ে কম্পিউটারটির দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। শুধুমাত্র আজমল ভয়ে ভয়ে বলল, “স্যার এটা খেতে চাইছে!”

জলীল স্যার রক্তচক্ষু করে টিটুর দিকে তাকালেন। টিটু সেই দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে বলল, “স্যার!”

“কী হল?”

“কম্পিউটার প্রোগ্রাম কি একটা ফ্রাণী? মানে ইয়ে—প্রাণী?”

পুরো ক্লাস পিনপতন শুরুতায় দাঁড়িয়ে রইল, তার মাঝে কম্পিউটারটা আবার একটা কাতুর শব্দ করল।



হেঁচকি

আজকে সঙ্কৰেলা খেলার জন্যে টুটুল আর ঝুমুর একটা খেলা আবিষ্কার করল, খেলাটা খুবই সোজা, শোওয়ার ঘরের বিছানা থেকে বালিশ, কোলবালিশ লেপ-তোশক সবকিছু ছুড়ে ছুড়ে মেঝেতে ফেলে দেওয়া। খেলার বর্ণনা শুনে এটাকে খুব মজার খেলা মনে না হলেও খেলাটি অসমৰ মজার—যে যত তাড়াতাড়ি নিচে যত বেশি জিনিস ফেলতে পারে সে হয় ফার্স্ট। আর এই খেলায় যে বেশিবার ফার্স্ট হয় তাকে রাত্রিবেলা ঘুমানোর সময় দুধ খেতে হবে না।

এই মজার খেলাগুলি টুটুল আর ঝুমুর প্রত্যেকদিন খেলতে পারে না। আশা এরকম খেলা দুচোখে দেখতে পারেন না। তাঁর ধারণা মেঝেতে বালিশ ফেলে দেওয়া খুব নোংরা কাজ। আবার কথা তো ছেড়েই দেওয়া যায়, তাঁর ধারণা খেলাধূলা করে শুধু দুষ্ট ছেলেরা, ভালো ছেলেরা সবসময় বসে বসে ইংরেজি ট্রান্স্লেশান করবে। কাজেই টুটুল আর ঝুমুর দুই ভাইবোন এই মজার খেলাগুলি খেলতে পারে যখন তাদের আবা-আমা কোনো বিয়েতে বা অন্য কোথাও বেড়াতে যান আর ছোট চাচা আসেন তাদের দুজনকে দেখেশুনে রাখতে।

ছোট চাচা হচ্ছেন সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে মজার মানুষ। তাঁর চুলগুলি থাকে উশকোখুশকো, তাঁর মুখে থাকে খোচা-খোচা দাঢ়ি, তাঁর পরনের টিশার্টটা হয় ঢলচলে, জিনসের প্যান্টটা হয় ভুসভুসে, পায়ের টেনিস গুটা হয় রৎ-ওঠা। তাঁকে দেখেই বোৰা যায় যে ছোট চাচা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ছোট চাচায় বগলে সবসময় কয়েকটা বই থাকে, বেশিরভাগই হয়

খটমটে ইংরেজি। বাসায় এসে ডাইনিং টেবিলে পা তুলে বসে ছোট চাচা
বই পড়তে শুরু করেন।

ছোট চাচার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে যে তিনি কোনোকিছুতেই না করেন
না। টুটুল যদি বলে, “ছোট চাচা, আজ ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না, শুধু
পেপসি খাব।”

ছোট চাচা তা হলে বলবেন, “ঠিক আছে। সেটাই ভালো—ভাত আবার
মানুষ খায় নাকি?”

বুমুর যদি বলে, “ছোট চাচা, তোমার ঘাড়ে উঠি?”

ছোট চাচা তা হলে ঘাড় পেতে দিয়ে বলবেন, “নে, ওঠ।”

টুটুল যদি বলে, “ছোট চাচা, আজ রাতে ঘুমাব না, সারারাত বসে বসে
চিতিতে মিষ্টার বিন দেখব, ঠিক আছে?”

তা হলে চোট চাচা হাতে কিল দিয়ে বলবেন, “ফার্ট ক্লাস আইডিয়া!
চল এখনই গিয়ে এক ডজন মিঃ বিনের ভিডিও রেন্ট করে আনি।”

বুমুর যদি বলে, “ছোট চাচা, আজকে প্ল্যানচেট করে ভূত আনব।”

ছোট চাচা তা হলে চোখ বড় বড় করে বলবেন, “কার ভূত আনা যায়?
হিটলারের, নাকি ইয়াহিয়া খানের?”

ছোট চাচা বাক্সাদের কোনো কথা হেসে উড়িয়ে দেন না। ক্লুলে যখন
নাটক হয় তখন রাত জেগে রাজপুত্র আর রাজকন্যার মুকুট তৈরি করে
দেন। কাগজ কেটে কেটে দৈত্যের মুখোশ তৈরি করে দেন, পার্ট মুখস্থ
করিয়ে দেন। যখন সায়েন্স ফেয়ারে দেখানোর জন্যে জ্যাতি ব্যাঙের দরকার
হয় ছোট চাচা সেই বাড়ী থেকে পলিথিনের ব্যাগে করে ব্যাঙ ধরে নিয়ে
আসেন। কাজেই ছোট চাচা যখন বাসায় আসেন তখন টুটুল আর বুমুরের
যা আনন্দ হয় সেটা আর বলার মতো নয়।

আজকেও যখন আববা-আম্বা ছোট চাচাকে বাসায় বেঁধে একটা গানের
অনুষ্ঠান দেখতে গেলেন তখন টুটুল আর বুমুরের খুব আনন্দ হল। আববা
আর আম্বা ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র টুটুল বলল, “আজকে পড়ব না ছোট
চাচা।”

ছোট চাচা হাতে কিল দিয়ে বললেন, “ভেরি গুড আইডিয়া।”

“আজকে বালিশ ছোড়াছুড়ি খেলব।”

ছোট চাচা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, “ফার্ট ক্লাস খেলা।”

বুমুর বলল, “তুমি খেলবে, ছোট চাচা?”

ছোট চাচা বললেন, “তোরা শুরু কর, যদি দরকার হয় খেলব।”

তখন টুটুল আর বুমুর চিৎকার করতে করতে খেলা শুরু করে দিল।
টুটুল আর বুমুর একেবারে পিঠাপিঠি ভাইবোন, তাই খেলতে খেলতে মাঝে



মাঝেই দুজনের মাঝে বাগড়া লেগে যায়। ঝুমুর ছোট কিন্তু তার তেজ বেশি, কিছু-একটা হলেই সে বাঘের মতো খামচি দিয়ে দেয়। আজকেও খেলার মাঝাখানে হঠাৎ টুটুলের নাকে খামচি দিয়ে দিল। টুটুল তখন কাঁদতে কাঁদতে এল ছোট চাচার কাছে নালিশ করতে। এসে দেখল ছোট চাচা টেবিলে পা তুলে বসে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, টুটুলকে দেখে বললেন, “কীরে টুটুল, তুই কাঁদছিস কেন?” তারপর হঠাৎ হেঁচকি তুলে বললেন, “হিংক।”

টুটুল তখন কান্না খামিয়ে বলল, “ছোট চাচা, তোমার হেঁচকি হয়েছে।”

ছোট চাচা মাথা নেড়ে বললেন, “হিংক।”

“হেঁচকি কেন হয় ছোট চাচা?”

“জানি না। হিংক। পেটের মাঝে মনে হয় একটা বড় ব্যাঙ থাকে। হিংক। সেই ব্যাঙ যখন রেগে যায় তখন পেটের মাঝে লাধি মারে। হিংক।”

টুটুল হিহি করে হেসে বলল, “তোমার পেটের মাঝে ব্যাঙ। হি হি হি। তুমি ব্যাঙ খেয়েছ ছোট চাচা। হি হি হি।”

টুটুল কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করতে এসে এখন কী দেখে হাসছে সেটা দেখার জন্যে ঝুমুরও চলে এল। বয়সে ছোট হলেও দুষ্টমি বুদ্ধিগুলি তার মাথায় খুব ভালোভাবে আসে। সে ছোট চাচাকে হেঁচকি তুলতে দেখে বলল, “ছোট চাচা, তোমার হেঁচকি ভালো করে দিই?”

“কেমন করে দিবি? হিংক।”

“পানি খেতে হবে তোমার।”

ছোট চাচা ডাইনিং-টেবিলের উপর রাখা খালি প্লাস দেখিয়ে বললেন, “এই দ্যাখ। হিংক। দুই প্লাস পানি খেয়ে ফেলেছি। হিংক। এখন পেটের ভিতরে পানি কেমন জানি ঢলঢল করছে নদীর মতো। হিংক।”

টুটুল বলল, “তুমি কিছু জান না ছোট চাচা।”

“কেন? কী হয়েছে? হিংক।”

“পানি খেতে হয় প্লাসের উলটোদিক দিয়ে, এই দ্যাখো, এইভাবে।”

টুটুল তখন পানির প্লাস হাতে নিয়ে পানি খেতে হলে যেখানে ঠোঁট লাগাতে হয় সেখানে না লাগিয়ে প্লাসের উলটোদিকে ঠোঁট লাগিয়ে বলল, “এইভাবে।”

“এইভাবে আবার কেমন করে পানি খাব? হিংক। পুতনি তো প্লাসের মাঝে চুকে যাবে। হিংক।”

টুটুল হিহি করে হেসে বলল, “এইভাবেই খেতে হবে ছোট চাচা। এইটাই নিয়ম—সবকিছুর নিয়ম থাকে।”

তখন ঝুমুরও হ্যাততালি দিয়ে বলল, “এইভাবে, এইভাবে।”

ছোট চাচা না হয়ে অন্য কোনো বড় মানুষ হলে কখনো এভাবে গ্লাস থেকে পানি খেত না, কিন্তু ছোট চাচা বাধ্য ছেলের মতো গ্লাসটা হাতে নিয়ে উলটো দিক দিয়ে পানি খাবার চেষ্টা করলেন। প্রথমেই ছোট চাচার খুতনি ভিজে গেলা, পানি খাবার জন্যে গ্লাসটা আরেকটু কাত করতেই হঠাৎ খানিকটা পানি তাঁর নাকে চুকে গেল। ছোট চাচা ফ্যাচ করে হেঁচে উঠলেন, পানি ছলকে পড়ল তাঁর কাপড়ে, ভিজে একশা হয়ে গেলেন ছোট চাচা। তাই দেখে আনন্দে হিহি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল দুই ভাইবোন।

ছোট চাচা খুব রেগে যাবার ভান করে বললেন, “হিংক। আগে শুধু হেঁচকি ছিল, এখন হল হাঁচি আর হেঁচকি! হিংক।”

ছোট চাচা ঝুমাল দিয়ে জামাকাপড় মুছে বললেন, “আসলে মানুষ চমকে উঠলে হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়। হিংক। দেখি তো, তোরা আমাকে চমকে দিতে পারিস কি না! হিংক।”

তখন টুটুল আর ঝুমুরের ভারি মজা হল, দুজনে মিলে তখন ছোট চাচাকে চমকে দেবার জন্যে বুদ্ধি বের করতে শুরু করল। পিছন থেকে ছুটে এসে “বু-ও-ও-ও-ও” বলে চেঁচিয়ে উঠল, হঠাৎ করে ঘরের লাইট নিভিয়ে দিল, মুখোশ পরে পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ল ছোট চাচার উপরে, রবারের একটা সাপ ছুড়ে দিল ছোট চাচার ঘাড়ে, ছোট চাচা একবারও চমকালেন না। টুটুল তখন একটা ঠোঙ্গ নিয়ে এসে ছোট চাচার কানের কাছে বিকট শব্দ করে ফাটিয়ে দিল, ছোট চাচা তখন চমকে উঠে বললেন, “আরে! আরে! করছিস কী? আমাকে চমকে দিতে বলেছি—কানের পর্দা তো ফাটাতে বলি নি!”

ছোট চাচার কথা শেব হবার আগেই ঝুমুর এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে ছোট চাচার উপরে ঢেলে দিল—এবাবে সত্যি সত্যি ভয়ানক চমকে উঠে একেবাবে লাফিয়ে উঠলেন, চিৎবার করে বললেন, “আরে, আরে! কী করলি? কী করলি?”

হাসতে হাসতে ঝুমুর আর টুটুলের একেবাবে চোখে পানি এসে গেল, তারা পেট চেপে হাসতে হাসতে মেঝেতে শয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে রেগেমেগে আগুন হয়ে যেত, কিন্তু ছোট চাচা একেবাবেই রাগ হলেন না, গ্লাসের বাকি পানিটা দুজনের উপর ঢেলে দেবার ভঙ্গি করলেন আর তাই দেখে দুজনে চিৎকার করে সারা ঘর ছোটাছুটি করতে লাগল।

খানিকক্ষণ পর টুটুল আর ঝুমুর ছোট চাচার কাছে ফিরে এসে বলল, “ছোট চাচা, তোমার হেঁচকি গিয়েছে?”

ছোট চাচা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হাসিমুখে বললেন, “মনে হয় গিয়েছে। এই দ্যাখ কোনো হেঁচকি নেই।” ছোট চাচার কথা শেষ হবার আগেই অবিশ্য হঠাতে হিক করে একটা হেঁচকি বের হয়ে এল, তারপর একটার পর একটা বের হতেই থাকল।

টুটুল বলল, “তার মানে চমকে উঠলেও হেঁচকি দূর হয় না।”

বুমুর বলল, “আরও বেশি করে চমকাতে হবে। ঠাণ্ডা পানি না দিয়ে চা দিলে মনে হয় ভালো হত।”

ছোট চাচা চোখ পাকিয়ে বললেন, “হিক। তোরা আমার হেঁচকি দূর করার জন্যে যত অত্যাচার করেছিস এখন মনে হচ্ছে হেঁচকি থাকাই ভালো। হিক।”

“আমাদের কেন দোষ দিছ ছোট চাচা?” বুমুর বলল, “তুমিই বলেছ চমকে দিতে। বল নাই?”

ছোট চাচা মাথা নেড়ে বললেন, “তা ঠিক। হিক।”

অন্য কোনো বড় মানুষ হলে কখনোই নিজের দোষ স্বীকার করত না, কিন্তু ছোট চাচার কথা আলাদা, ছোট চাচা সবসময় সব দোষ মেনে নেন। এই দিক দিয়ে ছোট চাচা বাঢ়াদের থেকেও ভালো।

ছোট চাচা খানিকক্ষণ মুখ গম্ভীর করে বসে থেকে অনেকগুলি হেঁচকি তুলে বললেন, “মনে পড়েছে। হিক।”

“কী মনে পড়েছে?”

“একসাথে অনেকখানি চিনি গিলে খেয়ে ফেললে নাকি হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়। হিক।”

“কেন ছোট চাচা?”

“বাওয়ার সময় গলার মাঝে চিনির রসে কী নাকি একটা ব্যাপার হয়। যা দেখি, এক চামুচ চিনি নিয়ে আয়।”

টুটুল আর বুমুর তখন চিনি আনতে গেল। টেবিলের উপর চিনি নেই, খাবার ঘরেও নেই, রান্নাঘরেও সেটা খুঁজে পাওয়া গেল না। বুমুর বলল, “মনে হয় তাকের উপর আছে।”

তাক অনেক উঁচু, টুটুল আর বুমুর কেউই নাগাল পেল না। খাবার ঘর থেকে একটা চেয়ার এনে তার উপরে দাঁড়িয়েও লাভ হল না। টুটুল তখন বুমুরকে বলল, “তুই চেয়ারটা শক্ত করে ধর। আমি হাতলের উপর দাঁড়াই।”

টুটুল যখন খুব সাবধানে হাতলের উপর দাঁড়িয়েছে ঠিক তখন কারেন্ট চলে গেল। কারেন্ট চলে গেলেও বাহিরের ঘরে একটু আলো থাকে, কিন্তু

রান্নাঘরে কী ঘুটমুটে অঙ্ককার! অঙ্ককারে চেয়ারের হাতলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টুটুলের মনে হল সবকিছু পড়ে যাচ্ছে। সে সত্যি সত্যি তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, নিজেকে সামলানোর জন্যে সে তাকের উপর কিছু-একটা ধরতে গেল, সেগুলিসহ সে উপর থেকে আছাড় থেয়ে পড়ল নিচে। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঝুমুর, তখন চেয়ারসহ, তাকের সব জিনিসপত্র, শিশি, বোতল, কোটা, ছুরি, চাকু সবকিছু নিয়ে ছড়মুড় করে নিচে এসে পড়ল। ভয়ংকর একটা শব্দ হল, মনে হল পুরো বাসার ছাদ ঝুঁকি ধসে পড়েছে নিচে। টুটুল আর ঝুমুর চিন্কার করে উঠল যন্ত্রণায়, তাদের মনে হল ঝুঁকি তারা মরেই গেছে যন্ত্রণায় আর ভয়ে।

ছেট চাচা ভয়ংকর শব্দ শনে, “কী হয়েছে? কী হয়েছে?” বলে চিৎকার করতে করতে অঙ্ককারে রান্নাঘরে ছুটে আসতে গিয়ে ডাইনিং-চেবিলে পা বেঁধে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে রান্নাঘরে এসে হাতিয়ে হাতিয়ে অঙ্ককারে চুলার কাছে থেকে খুঁজে খুঁজে ম্যাচ বের করলেন। কাঁপা-হাতে একটা ম্যাচের কাঠি জুলিয়ে যা দেখলেন তাতে ভয়ে তাঁর আঘা উড়ে গেল। টুটুল আর ঝুমুর দুজন জড়াজড়ি করে একজনের উপর আরেকজন পড়ে আছে, তাদের উপর চেয়ার, রাজ্যের জিনিসপত্র, ভাঙা শিশি-বোতল, বাসনপত্র। ছেট চাচা ছুটে গিয়ে তাদেরকে টেনে তুললেন, ভয়-পাওয়া গলায় জিজেস করলেন, “ব্যথা পেয়েছিস নাকি? টুটুল? ঝুমুর?”

দুজনে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল, ব্যথা সত্যিই পেয়েছে, কিন্তু কতটুকু পেয়েছে সেটা এখনও ঝুঁতে পারছে না। ছেট চাচা হাতড়ে হাতড়ে মোমবাতি বের করে জুলালেন, তারপর দুজনকে পরীক্ষা করে বললেন, “ছাল-চামড়া উঠে গেছে, হাত-পা ভাঙ্গেনি। যুব বেশি ব্যথা পাস নাই মনে হয়।”

ঝুমুর হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, “পেয়েছি ছেট চাচা।”

“তা পেয়েছিস, এই যে, কপালটা ফুলে গেছে।”

টুটুল বলল, “আমার মনে হয় ঘাড় ভেঙে গেছে চেট চাচা।”

“না, ঘাড় ভাঙ্গে নাই। ছাল উঠে গেছে, ধূয়ে একটু অ্যান্টিসেপ্টিক লাগিয়ে দেব, ঠিক হয়ে যাবে।”

টুটুল ফ্যাসফ্যাস করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, “ব্যথা করবে না তো?”

“করলে করবে। ব্যথাকে ভয় পেলে চলবে নাকি?”

ঝুমুর কাঁদতে কাঁদতে চারিদিকে তাকিয়ে বলল, “এখন কী হবে?”

“কিসের?”

“আম্বু যখন দেখবে রান্নাঘরের এই অবস্থা!”

ছোট চাচা আঙুলে তুঢ়ি দিয়ে বললেন, “আম্বু কেমন করে দেখবে? তোর আম্বু আসার আগে সব পরিষ্কার করে ফেলব না?”

টুটুল চারিদিকে তাকিয়ে বলল, “পারবে পরিষ্কার করতে? কয়টা শিশি ভেঙ্গেছে দেখেছ? আচারের বোতল। ধিয়ের বয়াম।”

ছোট চাচা হাত নেড়ে বললেন, “নো প্রবলেম। তিনজনে মিলে হাত লাগাব, তিনি মিনিটে ঘর পরিষ্কার হয়ে যাবে।”

টুটুল চোখ মুছল, ছোট চাচা যদি বলেন হয়ে যাবে তা হলে সেটা সত্য হয়ে যাবে।

“কাদিস না আর। আয় দুজনে আমার কাছে।” ছোট চাচা দুজনকে নিজের কাছে টেনে আনলেন। বললেন, “তোদেরকে একটু বুকে চেপে রাখি। ইশ! যা ভয় পাইয়েছিলি! মা গো!”

টুটুল আর ঝুমুর ছোট চাচার প্রশংস্ত বুকে মুখ লুকাল, তাদের শরীরে তেল আর আচার লেগে আছে, সেটা নিয়ে ছোট চাচা একটুও মাঝে ঘামালেন না, দুজনকে শক্ত করে ধরে রাখলেন। হঠাৎ ঝুমুর মুখ তুলে বলল, “ছোট চাচা!”

“কী হল?”

“তোমার হেঁচকি?”

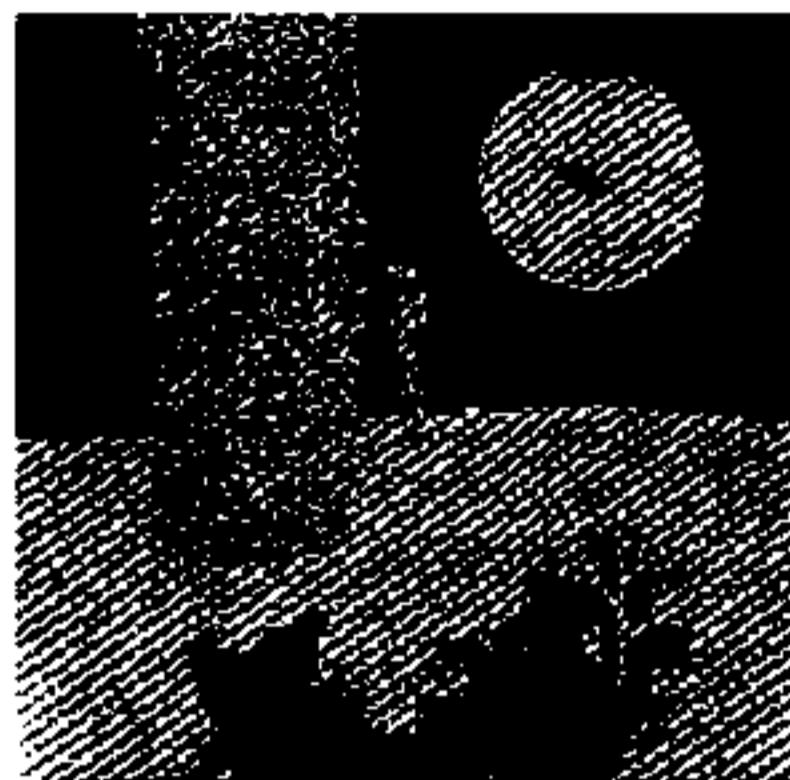
ছোট চাচা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বললেন, “তাই তো! আমার হেঁচকি! কোথায় গেল আমার হেঁচকি?”

“পালিয়ে গেছে! পালিয়ে গেছে!”

“তোদের ধূমধাড়াকা শুনে একেবারে জানের ভয়ে পালিয়ে গেছে হেঁচকি।”

টুটুল চিংকার করে বলল, “পালিয়ে গেছে! পালিয়ে গেছে!”

ঠিক তখন কারেন্ট চলে এল। ছোট চাচা তখন টুটুল আর ঝুমুরকে দেখে হাসতে লাগলেন। টুটুল আর ঝুমুরও তখন হাসতে লাগল। কেন যে সবাই হাসছে কেউ ঠিক করে জানে না, কিন্তু হাসার জন্যে কারণ থাকতে হবে সেটা আর কোন বইয়ে লেখা আছে?



ମୂର

ବ୍ୟାପାରଟି ଶୁଣୁ ହେଁଲେ ଏହିଭାବେ ।

ପିଯାଲଦେର ବାସାୟ ଶୁକତ ମାମା ବେଡ଼ାତେ ଏସେହେନ । ଶୁକତ ମାମା ଏମ.ଏସ.-ସି. ପାଶ କରେ ଏଥିନ ପୁରୋପୁରି ବେକାର । ଡାଟା ଏନ୍ଟି, ସ୍ଟକ ମାର୍କେଟ୍, ଇନ୍ଟାରନେଟ୍ ଏହିରକମ ସହଜ ପଞ୍ଚତିତେ ବଡ଼ଲୋକ ହେଁଯାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁଲିତେ ଧରା ଖେରେ ଏଥିନ ଧର୍ମକର୍ମ ଏବଂ ଆଧିଭୌତିକ ବ୍ୟାପାରେ ମନୋଯୋଗ ଦିଯେହେନ । ରାତ୍ରେ ସବାଇ ମିଳେ ଏକ୍-ଫାଇଲ ଦେଖିଛିଲ, ଜମଜମଟ ଏକଟା ଭୌତିକ ଦୃଶ୍ୟ (ହାତ-ପା ନେଇ ବିଦୟୁଟେ ଏକଟା ଭୂତେର ମାଥା ମୋଢାରେର ପା ପାଇଁ କାହିଁଡେ ଧରଛେ) ହଠାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଚଲେ ଗେଲ । ଆବା ବଲଲେନ, “ତାଲୋଇ ହଲ—ଏହି ଗୀଜାଖୁରି ଆର କତ ଦେଖା ଯାଯ !”

ଆମ୍ବା ବଲଲେନ, “ଏଗୁଲି ଦେବେ ମାନୁଷ ସେ କୀ ମଜା ପାଯ ! ଖାମୋକା ବାଚାକାଚାଦେର ରାତ୍ରେ ଭୟ ଦେଖାନୋ !”

ପିଯାଲେର ଛୋଟ ବୋନ ଟୁଶକି ବଲଲ, “ଇଶ ! କୀ କିଉଟ ଛିଲ ଭୂତଟା ! ଯା ମାଯା ଲାଗେ ଦେଖଲେ !”

ଏକ୍-ଫାଇଲ ଦେଖେ ଭୟେ ପିଯାଲେର ହାତ-ପା ଶରୀରେର ଭିତର ଚୁକେ ଯାଛିଲ, ଇଚ୍ଛେ ହଲ ଅନ୍ଧକାରେ ଟୁଶକିର ମାଥାଯ ଏକଟା ରନ୍ଦା ଲାଗାଯ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ନିଜେକେ ସାମଲେ ନିଲ ।

ଶୁକତ ମାମା ଏକଟା ଦୀର୍ଘନିଶ୍ଵାସ କେଲେ ବଲଲେନ, “ଏଇସବ ନକଳ ଭୂତ ଦେଖେ ଚୋଥ ପଚେ ଗେଲ । ସତିକାରେର ଏକଟା ଭୂତ ପେତୋମ, ଦେଖତାମ—”

ଆବା ବଲଲେନ, “ସତିକାରେର ଭୂତ କି ହିନ୍ଦି ସିନ୍ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନାକି ସେ ଇଚ୍ଛେ କରଲେଇ ମୋଡେର ଦୋକାନ ଥେକେ ରେନ୍ଟ କରେ ଆନବେ ?”

শওকত মামা বললেন, “আমি কি তা-ই বলেছিঃ কেউ যদি বলে আমাকে সত্যিকারের ভূত দেখাতে পারবে, পাহাড় নদী ডিঙিয়ে চলে যাব। দরকার হলে লাখ-দুই লাখ টাকা খরচ করে ফেলব।”

আবো বললেন, “ভূত দেখার জন্যে পাহাড় নদী ডিঙাতে হয় না—আর তোমার চাকরিবাকরি নাই লাখ-দুই লাখ খরচ করবে কেমন করে? ভূত দেখার জন্যে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সাহস।”

শওকত মামা জিজ্ঞেস করলেন, “বলতে চাচ্ছেন আমার সাহস নাই?”

আবো কিছু বললেন, না, অঙ্ককার বলে মুচকি হাসলেন কি না সেটাও দেখা গেল না।

শওকত মামা এবারে মেঘবরে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি বলছেন দুলাভাই আমার সাহস নাই?”

“আমি কী বললাম তাতে কী আসে যায়? সাহস থাকলে আছে, না থাকলে নাই।”

“আপনি যদি চান আমি লাশকাটা-ঘরে রাত কাটাতে পারি। বাজি ধরবেন?”

“আজকালকার লাশকাটা-ঘরে থাকা কঠিন কী? ইলেকট্রিক লাইট-ফ্যান-কর্মচারী কম্পিউটার! সাহস থাকলে যাও রত্নপুরের রাজবাড়িতে, এক রাত কাটিয়ে আসো।”

“কী আছে সেই রাজবাড়িতে।”

“কী নেই? বাদুড় চামচিকা তেলাপোকা শেয়াল খাটাস বনবেড়াল—তবে জোছনারাতে রাজবাড়ির সামনে বড় দিঘি আছে সেখানে নাকি পরীরা সাঁতার কাটতে আসে। সাহস থাকলে দেখে আসো।”

শওকত মামা শক্ত গলায় বললেন, “ঠিক আছে, পরের পূর্ণিমাতেই যাচ্ছি। আপনার ভিডিও ক্যামেরাটা দেন, পুরো পরীর নাচ ভিডিও করে আনব।”

“ভিডিও করতে হবে না। দাঁতে দাঁত লেগে হার্টফেল না করলেই হল।”

ঠিক এরকম সময়ে ইলেকট্রিসিটি চলে এল, অঙ্ককারে পরিত্যক্ত রাজবাড়ির সামনের বিশাল দিঘিতে জোৎসুনারাতে পরীরা নেমে আসছে দৃশ্যটির কথা চিন্তা করে যেরকম গা-হৃষ্ম করছিল, ঘরের আলো জুলে যাবার পর সেটাকে আর এত ভয়ের মনে হল না। পিয়াল বলল, “শওকত মামা, আমাকে নেবে তোমার সাথে?”

শওকত মামা মুখ শক্ত করে বললেন, “তোর আবো ভাববে একা একা ভয় পাই বলে তোকে নিছি—না হলে নিতাম।”

“নাও-না, পুরী! আমি কোনোদিন পরী দেখি নাই।”

টুশকি বলল, “আমিও যাব আমিও যাব। পরী কী কিউট! কী মায়া লাগে!”

টেলিভিশনে আবার এক্স-ফাইল শুরু হয়ে গেল বলে ব্যাপারটা আপাতত চাপা পড়ে গেল। রাতে যুমানোর সময় শওকত মামা পঞ্জিকা দেখে খৌজ নিয়ে এলেন যে পরের শনিবার পূর্ণিমা। পরদিন সকালে খৌজ নিয়ে এলেন যে, রতনপুরে বাস সার্ভিস আছে, সকালে রওনা দিলে দুপুরের মাঝে পৌছে যাবে—সত্তর টাকা ভাড়া। বিকালবেলার মাঝে খৌজ নিয়ে এলেন সেখানে রতনপুর বোর্ডিংহাউস বলে একটা থাকার জায়গা আছে, প্রতি সিটি কুড়ি টাকা। রাতের মাঝে শওকত মামা রতনপুর রাজবাড়িতে পরী দেখতে যাওয়ার প্রোগ্রাম পাকা করে ফেললেন। যখন দেখা গেল সত্যিই শওকত মামা রাজবাড়ির দিঘিতে পরীদের সাঁতারকাটা দেখতে যাচ্ছেন তখন পিয়ালও ধরে বসল সেও যাবে। প্রথমে ভেবেছিল আববা বুঝি রাজি হবেন না, কিন্তু দেখা গেল খুব সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। যাবার সময় শুধু বললেন, “তোর মামাকে দেখে রাখিস। আর শোন—যাওয়াদাওয়া নিয়ে খুব সাবধান। রান্না করা জিনিস ছাড়া কিছু খাবি না।”

আববা এত সহজে রাজি হয়ে গেলেন দেখেই পিয়াল বুঝতে পেরেছিল জায়গাটা নিশ্চয়ই খুব নিরীহ কিছু হবে। রতনপুরে পৌছে দেখল তার সন্দেহটা সত্য। যে-জিনিসটার নাম রাজবাড়ি সেখানে কোনো বাড়ি নেই, খালিকটা পুরানো ভিটে পড়ে আছে। যে-দিঘিতে পরীদের সাঁতারকাটার কথা সেটা একটা ছোট পুকুরের মতন, এক সময় হয়তো বড় ছিল, মজে গিয়ে ছেটে হয়ে গেছে। পুকুরের একপাশে বাঁধানো ঘাট আছে, ফাঁক-ফোকর দিয়ে অশ্বথ গাছ বের হয়ে এসেছে। তবে জায়গাটা নির্জন, আশে-পাশে ধানিজমি আছে, একপাশে ছোট একটা চালাঘরের মতো আছে। কিছু ছেট ছোট বাঢ়া বিশাল বিশাল গোরু চড়িয়ে নিছিল। শওকত মামা তাদের কাছেও খৌজখবর নিলেন। এই দিঘিতে পরী নেমে আসে সে-ব্যাপারে কেউ কিছু জানে বলে মনে হল না।

সকেবেলা রতনপুরের বিখ্যাত বোর্ডিংহাউস দেখে পিয়াল এবং শওকত মামা দুজনেই ভিরমি খেলেন। ছোট অঙ্ককার একটা কুম্হে ছয়টা তক্ষপোশ পাতা—প্রতি তক্ষপোশে তেলচিটচিটে তোশক গুটিয়ে রাখা আছে। ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় তার টানানো, সেই তার থেকে মশারি ঝুলছে। দিনের বেলাতেই ঘর অঙ্ককার, ভিতরে একটা বোটকা গুৰু, শওকত মামা বললেন বিড়ি এবং সিগারেটের, পিয়ালের ধারণা এই ঘরটি নিশ্চয়ই গুঁটকিমাছের আড়ত হিসেবে ব্যবহার হয়। বোর্ডিংহাউসটা যদি ভদ্রগোছের কিছু হত তা হলে পরীর নাচ দেখার প্রোগ্রাম বাতিল করে সেখানে রাত কঢ়ানোর একটা সংগ্রামনা ছিল, কিন্তু সেটি একবার দেখার পর রাজবাড়িতে দিঘির পাড়ে সারারাত বসে থাকাটা এমন-কিছু কঠিন মনে হল না।

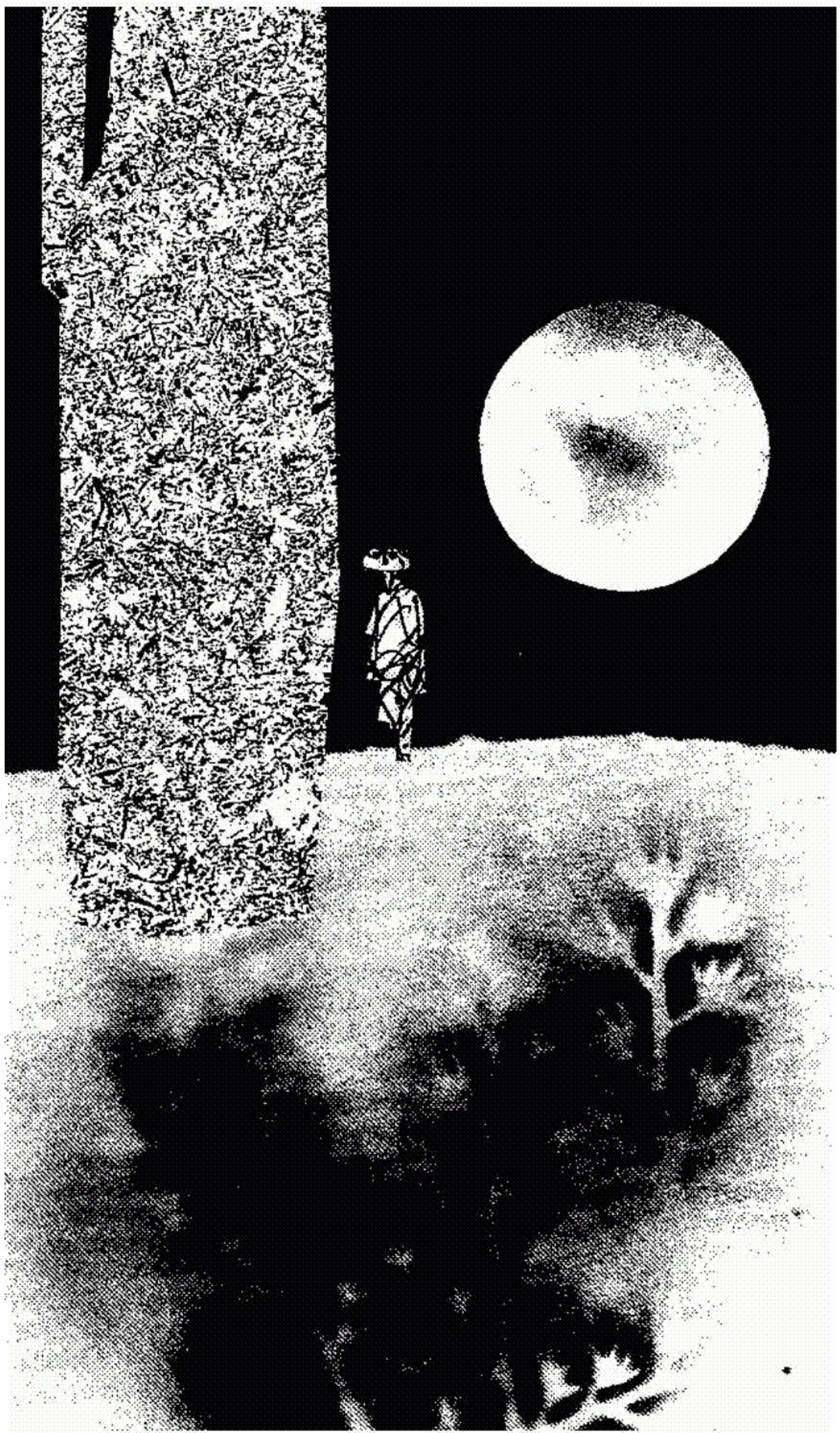
শওকত মামা পিয়ালকে নিয়ে বিকালবেলা একটা রেন্টুরেন্টে ভরপেট খেয়ে রাজবাড়িতে হাজির হলেন। তাদের সাথে একমাত্র অন্তর ছয়-ব্যাটারির বড় টর্চলাইট। সেটা বড় এবং ওজনদার, লাঠি হিসেবে ব্যবহার করা এমন-কিছু কঠিন নয়। রাজবাড়ির পাশে যে-চালাঘরটা আছে সেটা মোটামুটি পরিষ্কার, পিয়াল আর শওকত মামা মিলে সেটাকে ঝেড়েপুছে আরও পরিষ্কার করে নিল। সঙ্গে হওয়ার আগেই পুরো জায়গাটা ভালো করে একবার ঘুরে এসে তারা চালাঘরে হাজির হল। ঘরের মেঝেতে একটা চাদর বিছিয়ে নিয়ে তার উপর দুজন আসন করে বসেছে। ঠিক সঙ্গেবেলা পূর্ণিমার চাঁদ ওঠার পর যেরকম চারিদিকে জোঞ্চা ছড়িয়ে পড়ার কথা সেরকম কিছু হল না। পুকুরপাড় কেমন যেন অঙ্ককার অঙ্ককার বয়ে গেল—বাঁশবাড়ি গাছগাছালি ভেদ করে চাঁদের আলো আসতে পারছিল না। চারিদিকে সুমসাম নীরবতা, তার মাঝে পিয়াল ফিসফিস করে বলল, “মামা, এত অঙ্ককারে পরী দেখব কেমন করে?”

“রাত আরেকটু গভীর হোক, চাঁদ উপরে উঠে এলে দেখবি চারিদিক আলো হয়ে যাবে।”

শওকত মামার কথা সত্যি, খানিকক্ষণ পর চাঁদ একটু উপরে উঠে আসতেই হঠাতে জোঞ্চার নরম আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পুকুরঘাট গাছপালা বোপবাড়ি চাঁদের আলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠল। চাঁদের আলোটি মনে হয় খুব চিন্তাভাবনা করে তৈরি করা হয়েছে, যদিও সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তবুও সবকিছু কেমন যেন অস্পষ্ট এবং রহস্যময়। একটি জিনিস কেমন করে একই সাথে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট হতে পারে পিয়াল ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

রাত গভীর হবার পর নতুন একটি সমস্যা দেখা গেল, সেটা হচ্ছে মশা। এই এলাকায় মশা সম্ভবত কয়েক শুগ থেকে অভুক্ত, হঠাতে করে এরকম তাজা দুজন মানুষ পেয়ে তাদের মাথা-খারাপ হয়ে গেল। বুদ্ধি করে একটা মশার কয়েল নিয়ে এলে হত, কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। শরীরের পুরোটা ভালো করে ঢেকে দুজন বসে রাইল। তবুও মশার কামড় থেকে রক্ষা পাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। শুধুমাত্র মেয়ে-মশারা নাকি রক্ত খায়, যদি পুরুষ-মশারাও রক্ত থেত তা হলে কী বিপদ হত কে জানে!

ধীরে ধীরে রাত আরও গভীর হতে থাকে। চারিদিকে সুমসাম নীরবতা বলে অনেক রুকম শব্দ হঠাতে করে খুব স্পষ্টভাবে শোনা যেতে থাকে। বিঁঝিপোকার ডাক যে এত কর্কশ সেটা পিয়াল এর আগে কখনো লক্ষ করেনি। খুব হালকা বাতাসেও নারকেল গাছের পাতার মাঝে একধরনের শিরশির শব্দ হয় সেটাও পিয়াল জানত না। যত ছোটই হোক শুকনো পাতার উপর দিয়ে যে কোনো প্রাণী নিঃশব্দে যেতে পারে না সেটাও পিয়াল



এই প্রথমবার আবিষ্কার করল। জোছনার নরম আলোতে রাতের বিচ্ছি সব
শব্দ শুনতে শুনতে পিয়াল কেমন জানি মোহগ্নত হয়ে পড়ে। ঠিক কখন সে
ঘূর্মিয়ে পড়েছে সে নিজেও জানে না।

পিয়ালের হঠাতে করে ঘূর্ম ভাঙল, কেন ভাঙল সে জানে না। ঘূর্মালোর
আগে সে মশার গুলশুন, বিঁকিপোকার ডাক, গাছের পাতার শিরশির শব্দ,
নিশাচর পাথির ডাক শুনতে শুনতে ঘূর্মিয়েছে কিন্তু এখন কোথাও কোনো
শব্দ নেই। চারিদিকে খুব আশ্চর্য একধরনের নৈঃশব্দ, এই নৈঃশব্দের মাঝে
কেমন জানি একধরনের একটা আতঙ্ক আতঙ্ক ভাব, মনে হয় একটা ভয়ানক
কিছু ঘটবে। পিয়ালের ভিতরে একধরনের চাপা ভয় এসে ভর করে এবং
ঠিক তখন সে খুব মৃদু একধরনের নৃপুরের শব্দ শুনতে পেল। পিয়াল চমকে
ওঠে, শব্দটা আসছে ওপর থেকে। শওকত মামা চাদর-মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি
মেরে ঘূর্মাছেন, তাঁকে ডেকে তুলবে কি না সে বুঝতে পারল না। নৃপুরের
শব্দটা আরও একটু স্পষ্ট হল এবং পিয়াল হঠাতে নৃপুরের সাথে মেঘের
গলায় হাসির শব্দ শুনতে পেল, শব্দটা আসছে আকাশ থেকে। পিয়াল
গুটিসুটি মেরে চালাঘরের দরজা দিয়ে মাথা বের করে আকাশের দিকে
তাকায় এবং হঠাতে করে তার সারা শরীর জয়ে যায়। আকাশে জোছনা-
আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ধৰ্মধরে সাদা কিছু পরী উড়তে উড়তে নেমে
আসছে। তাদের পাখা নড়ছে খুব মৃদুভাবে, শরীরে হালকা স্বচ্ছ একধরনের
কাপড়, বাতাসে উড়ছে। শরীরের কোথায় জানি নৃপুর বাঁধা আছে, মিষ্টি টুং
টাং শব্দ ভেসে আসছে সেখান থেকে।

কিছুক্ষণ আগে বুকের ভিতর যে চাপা ভয় ছিল হঠাতে সেই ভয় কেটে
যায় পিয়ালের, হঠাতে করে মনে হয় সে বুঝি ছুটে যেতে পারবে বাইরে, হাত
তুলে ডাকতে পারবে পরীদের। কিন্তু পিয়াল তার কিছুই করল না,
চালাঘরের দরজায় নিঃশব্দে বসে রইল।

পরীগুলো ভাসতে ভাসতে, কথা বলতে বলতে, নিজেদের মাঝে
হাসাহসি করতে করতে নিচে নেমে এল। পুকুরঘাটে একজন একজন করে
নেমে এসে তারা হাত-ধরাধরি করে ঘূরতে থাকে, নিজেদের মাঝে এখনও
কথা বলছে, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে পিয়াল, কিন্তু কী নিয়ে কথা বলছে সেটা
বুঝতে পারছে না। যেটুকু কথা বলে তার চাহিতে হাসে অনেক বেশি—
হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ে ঢলে পড়ে আদুরে মেঘেদের
মতো। পিয়াল নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইল। পুকুরের সামনে ফাঁকা
জায়গাটায় হাঁটাহাঁটি করে তারা একটু ছড়িয়ে পড়ে, পুকুরঘাটে গাছপালার
মাঝে খৌজাখুজি করে ফুল কুড়াতে থাকে। মানুষের যেরকম উঁচুতে কিছু—
একটা ধরার জন্যে দুই হাত উঁচু করতে হয় তাদের সেরকম কিছুই করতে
হচ্ছে না। যখনই দরকার হচ্ছে পাখা নাড়িয়ে ভেসে উঠছে উপরে। পিয়াল

অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে, ব্যাপারটি যে ঘটছে সেটা তার বিশ্বাসই হতে চায় না।

পরীগুলি ফুল তুলতে তুলতে গুনগুন করে গান গাইতে থাকে, কী মিষ্টি গলার সুর! সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন তাদের গানের সুর—আগে কখনো পিয়াল এরকম সুর শোনেনি, বুকের ভিতরে কেমন জানি একধরনের কাঁপুনি হতে থাকে। একই সাথে আনন্দের এবং বিষাদের সুর।

পরীগুলি গান গাইতে দিঘির ঘাটে এসে একত্র হতে শুরু করে, গায়ের কাপড় ঘাটে খুলে রেখে দিঘির পানিতে পা ডুবিয়ে বসে আবার বিচ্ছিন্ন গলায় কথা বলতে থাকে, কথাগুলি শোনা গেলেও বোঝা যায় না, অনেকটা জোছনার আলোর মতো যেখানে সবকিছু দেখা গেলেও অস্পষ্ট রহস্যময় রয়ে যায়।

ঠিক এরকম সময় শওকত মামা ঘুমের মাঝে নড়েচড়ে ওঠেন। শওকত মামা বিড়বিড় করে কিছু বললেন। জ্যেরে কিছু-একটা বলে পরীদের ভয় না দেখিয়ে দেন ত্বে পিয়াল চাপা গলায় ডাকল, “মামা!”

শওকত মামা চোখ খুলে তাকিয়ে বললেন, “কী?”

“পরী এসেছে মামা।”

শওকত মামা ধড়মড় করে উঠে বসলেন, চিৎকার করে কিছু-একটা বলে ফেলছিলেন প্রায়—পিয়াল প্রায় লাফিয়ে মামার মুখ চেপে ধরল। মামা ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, “কো-কো-কোথায় পরী?”

“ঐ যে! দিঘির ঘাটে।” মামা দিঘির ঘাটের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেলেন, তাঁর হাত-পা কাঁপতে লাগল, মুখ দিয়ে কেমন যেন চাপা গোঙানির মতো শব্দ হতে লাগল। পিয়াল শওকত মামাকে ধরে ফিসফিস করে বলল, “মামা, শব্দ কোরো না। পরী উড়ে যাবে।”

মামা তবুও কেমন জানি গোঙাতে গোঙাতে হয়-ব্যাটারির টর্চলাইটা হাতে নিয়ে কিছু বোঝার আগেই দিঘির ঘাটের দিকে জ্বালিয়ে ধরলেন। তীব্র চোখধাঁধানো আলোতে চারিদিকে ধবধব করে উঠল এবং হঠাৎ রঞ্জ-শীতল-করা আর্টনাদ করে পরীগুলি পাখা ঝাপটে আকাশের ওড়ার চেষ্টা করতে লাগল। মেয়েলি গলায় কাতর শব্দ করে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে পরীগুলি মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। পিয়াল চিৎকার করে বলল, “কী করলে মামা! কী করলে তুমি!”

মামা তোতলাতে তোতলাতে বললেন, “গে-গে গেছে সবগুলি!”

“কী ভয় পেয়েছে তুমি শোন নি? কেন লাইট জ্বালালে?”

“সর্বনাশ!” মামা কাপা গলায় দরজদশরিফ পড়ে নিজের বুকে ফুঁ দিয়ে বললেন, “আরেকটু হলে গিয়েছিলাম আর কি!”

পিয়ালের ইচ্ছে হল মাঝাকে মেঝেতে চেপে ধরে ছয়-ব্যাটারির টর্চলাইট দিয়ে মাথার মাঝে একটা ঘা বসিয়ে দেয়, কিন্তু সেটা তো আর সত্যিই করতে পারে না, তাই চালাঘর থেকে বের হয়ে দিঘির দিকে হাঁটতে লাগল। মাঝা পিছন থেকে ভাঙা গলায় বললেন, “পিয়াল! আমাকে একা ফেলে কোথায় যাচ্ছিস?”

“কোথাও না। দিঘির ঘাট থেকে হেঁটে আসছি।”

“যাসনে একা একা—কিছু-একটা হয়ে যাবে পরে।”

পিয়াল মাঝার কথায় কোনো পাতা না দিয়ে দিঘির ঘাটের কাছে এসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল, কী-একটা সিঁড়িতে পড়ে আছে। পিয়াল দৌড়ে গেল কাছে, জোছনার আলোতে অবাক হয়ে দেখল একটা পরী সিঁড়িতে পড়ে আছে। পিয়াল ছুটে গেল কাছে, জোছনার নরম আলোতে পরীটিকে আবছা দেখা যাচ্ছে, হাত দুটি ছড়িয়ে আছে পাশে, একটা পাখা খোলা, অন্যটি আধখোলা, শরীরে হালকা অর্ধসজ্জ একধরনের কাপড়।

মাঝা চালাঘর থেকে কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, “কী হল পিয়াল?”

পিয়াল মাঝার কথার উত্তর না দিয়ে পরীটার কাছে ঝুঁকে এল, মিষ্টি একটা গুঁজ ভেসে এল সাথে সাথে। সাবধানে সে পরীটিকে স্পর্শ করে, মনে হয় এক্ষুনি বুবি সেটি অদৃশ্য হয়ে যাবে, কিন্তু পরীটি অদৃশ্য হয়ে গেল না। পিয়াল পরীটির হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, “এই যে, এই যে পরী—ওঠো।”

পরীটি উঠল না, নিখর হয়ে পড়ে রইল। মাঝা চালাঘর থেকে আবার ভাঙা গলায় ডাকলেন, “কী হল পিয়াল?”

পিয়াল উঠে দাঁড়িয়ে বল, “পরী।”

“পরী?”

“হ্যাঁ।”

শওকত মাঝা প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, “তা হলে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পালিয়ে আয়।”

পিয়াল সাবধানে পরীটাকে তোলার চেষ্টা করে অবাক হয়ে দেখল সেটি একেবারে পেঁজা তুলোর মতো হালকা। পিয়াল দুই হাতে জড়িয়ে ধরে পরীটাকে তুলে নেয়, মাঝা দূর থেকে চিন্কার করে বললেন, “কী করছিস? কী করছিস তুই!”

পিয়াল কোনো কথা না বলে পরীটাকে তুলে নিয়ে চালাঘরের দিকে হাঁটতে থাকে, মনে হতে থাকে হালকা পরীটি তার হাতের চাপে বুবি গুঁড়িয়ে যাবে। সাবধানে বুকের সাথে চেপে ধরে নিয়ে এসে পিয়াল পরীটাকে চালাঘরের মেঝেতে শুইয়ে দিল। মাঝা একবার টর্চলাইট জুলাতে চেষ্টা

করেছিলেন, পিয়াল চিৎকার করে বলল, “আলো জ্বালিয়ো না মামা, দেখছ
না কী হয় আলো জ্বালালে!”

পিয়াল পরীটার বুকের কাছে কান লাগিয়ে শুনতে পেল বুকের মাঝে
ধূকপুক শব্দ হচ্ছে। নিশ্বাস ফেলে বলল, “এখনও বেঁচে আছে মামা।
একজন ডাঙ্গার ডাকতে হবে।”

“ডাঙ্গার?” মামা ঢোক গিলে বললেন, “ডাঙ্গার কী করবে?”

“চিকিৎসা করবে।”

“পরীর চিকিৎসা?” মামা আন্তে আন্তে তার সাহস ফিরে পাঞ্চেন, একটু
এগিয়ে এসে বললেন, “তার চাইতে দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফ্যাল।”

“হা পা বেঁধে ফেলব?”

“হ্যাঁ, তারপর ধরে নিয়ে যাই ঢাকা। চিন্তা করতে পারিস কী অবস্থা
হবে জ্যান্ত একটা পরী ধরে নিয়ে গেলে? চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে দেব।
তার চাইতে তালো বি.বি.সি. নাহর সি.এন. এন.—”

শঙ্কুক মামা উৎসাহ নিয়ে এবারে এগিয়ে এসে সত্যি সত্যি জুতোর
ফিতা খুলে সেটা দিয়েই পরীর হাত-পা বাঁধতে শুরু করলেন। পিয়াল বাধা
দেওয়ার চেষ্টা করতেই মামা একটা ধমক দিয়ে বললেন, “ইঠাং জ্বান ফিরে
যদি উড়ে যায়?”

পরীকে বাঁধতে বাঁধতে মামা তাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন, বললেন,
“পাখাটা দেখেছিস কীরকম?”

“কীরকম?”

“আমি ভেবেছিলাম বাদুড়ের মতো হবে, চামড়ার। আসলে এটা
পালকের। এই দ্যাখ পিঠের হাড় থেকে বের হয়ে এসেছে। কী হালকা
পালক দেখেছিস?”

পিয়াল এগিয়ে এসে বলল, “মামা, প্লীজ বেঁধো না, ব্যথা পাবে।”

“চুপ কর তুই গাধা কোথাকার! একটা পরী নিয়ে যদি সেটা নিয়ে
গবেষণা করা যায় পৃথিবীতে কীরকম হৈচে পড়ে যাবে টের পাছিস?”

পিয়াল ব্যাপারটা টের পাছিল এবং সেজন্যেই তার মন-খারাপ হয়ে
গেল। মামা চকচকে চোখে বললেন, “শরীরটা একেবারে হালকা, এইজন্যে
উড়তে পারে। হাড়গুলি নিশ্চয়ই ফাঁপা। মাসলগুলি দেখেছিস কীরকম?”

ফুটফুটে অচেতন পরীটার দিকে তাকিয়ে পিয়ালের একেবারে বুকটা
ভেঙে যাচ্ছিল, সে কিছুই বলল না। মামা বাঁধা শেষ করে বললেন, “এখন
আর পালাতে পারবে না।”

মামা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, “এখন দরকার একটা বাস্তু।”

“বাস্তু?”

“হ্যাঁ। বাস্তে ভরে ঢাকা নিতে হবে, কেউ দেখে ফেললে বিপদ হয়ে
যাবে।”

উভেজনায় মামাৰ নিশ্চাস পড়ে না, পিয়ালেৱ পিৰ্ছে হাত দিয়ে বললেন, “আৱ কোনো চিন্তা নাইৱে পিয়াল, এক ধাক্কায় বড়লোক হয়ে যাব। আৱ চাকৱিও খুঁজতে হবে না। লোকজন এখন আমাৰ কাছে আসবে চাকৱি খুঁজতে। পৱীটাকে নিয়ে একটা আমেরিকা ট্ৰিপ দিতে পাৱলে ফাটাফাটি হয়ে যাবে।”

মামা চালাঘৰে পায়চাৰি কৱতে কৱতে বললেন, “জিনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰদেৱ আৱ মাইক্ৰোবায়োলজিস্টদেৱ মাথা-খাৱাপ হয়ে যাবে। ডি. এন. এ. স্ট্রাকচাৰ কীৱকম কে জানে?”

পিয়াল বলল, “মামা, যদি আৱ জ্ঞান ফিৰে না আসে?”

“আসবে না কেন? আমৰা তো আৱ গুলি কৱি নাই, শুধু লাইট ফেলেছি।”

“কে বলতে পাৱে, ওদেৱ কাছে লাইটই হয়তো গুলিৰ মতো।”

“তা হলে আৱ কী কৱা!” মামা হাত নেড়ে বললেন, “মৰে গেলে মৰে যাবে আৱ কি! শুনিস নি কথায় বলে মৰা হাতিৰ দাম লাখ টাকা! সেৱকম মৰা পৱীৰ দাম হচ্ছে কোটি টাকা!”

পিয়াল কিছু বলল না। মামা হাতে কিল দিয়ে বললেন, কেটেকুটে ভিতৰে কী আছে দেখা যাবে তখন। হাটেৱ ফাংশন কীৱকম, লাংস কত বড়, কিভনি কয়টা, লিভাৱেৱ সাইজ কী! চিন্তা কৱতে পাৱিস তুই? সককিছু দেখা শেষ হলে ফৰ্মালিনে ডুবিয়ে বড় কাচেৱ অ্যাকুয়ারিয়ামে ডুবিয়ে রাখব।”

পৱীটাকে নিয়ে কী কৱা যায় সেটা নিয়ে মামা খানিকক্ষণ চিন্তা কৱে আৱ দেৱি কৱতে চাইলেন না। ঠিক কৱলেন তখন-তখনি লোকালয়ে গিয়ে একটা বাঞ্ছ তৈৰি কৱে নিয়ে আসবেন, তোৱ হওয়াৰ আগেই সেই বাঞ্ছ নিয়ে ঢাকা বুওনা দিয়ে দেবেন। বাঞ্ছ আনতে যাবাৰ সময় পিয়াল একা একা এই পৱীকে পাহাৱা দিতে ভয় পাৰে কি না জানতে চাইলেন, পিয়াল জানাল সে ভয় পাৰে না। শওকত মামা বললেন, তিনি শুধু যাবেন আৱ আসবেন—ঘাবড়ানোৱ কোনো কাৱণ নেই। মামা তাঁৰ ছয়-ব্যাটাৱিৰ টৰ্চলাইট জুলিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে যাবাৰ সাথে সাথে পিয়াল পৱীটাৰ গালে হাত দিয়ে অল্প অল্প নেড়ে তাৰ জ্ঞান ফিৰিয়ে আনাৰ চেষ্টা কৱে। মানুষেৰ মুখে পানিৰ ঝাপটা দিলে জ্ঞান ফিৰে আসে, পৱীদেৱও সেটা হবে কি না কে জানে! সাত-পাঁচ ভেবে দিঘি থেকে এক আঁজলা পানি এনে সে পৱীটাৰ মুখে ঝাপটা দিল, সাথে সাথেই পৱীটা নড়ে উঠে একটা কাতৰ শব্দ কৱল।

পিয়াল বলল, “এই যে, এই যে পৱী, জেগে ওঠো।”

সত্যি সত্যি পৱীটা জেগে উঠল, ধড়মড় কৱে উঠে বসাৰ চেষ্টা কৱতে কৱতে দুই হাত-পা নিজেৱ কাছে টেনে এনে ভয় পেয়ে ঘৰেৱ এক কোনাৰ

দিকে যেতে চেষ্টা করতে থাকে। পিয়াল উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত নেড়ে বলল, “তোমার কোনো ভয় নেই। আমি কিছু করব না—কিছু করব না।”

পরীটা পিয়ালের কথা বুঝতে পারল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু ছটফট করাটা খামিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল। পিয়াল বলল, “আমার নাম পিয়াল। তোমার নাম কী?”

পরীটা কোনো কথা বলল না। পিয়াল বলল, “তোমরা কোথায় থাক, তোমার দেশ কোথায়?”

পরীটা একটা নিশ্চাস ফেলে হঠাতে রিনবিনে মিষ্টি গলায় বলল, “ব্যথা কেন দিলে আলো জ্বেলে জ্বেলে?”

পিয়াল বলল, “আমি দিইনি। আমার মামা—এম. এস-সি. পাশ করে বেকার বসে আছেন—সেই মামা দিয়েছেন। তোমার কি বেশি ব্যথা লেগেছে?”

পরীটা মাথা নাড়ল। পিয়াল বলল, “আমি খুব দুঃখিত। ভেরি ভেরি সরি। আমার কাছে প্যারাসিটামল আছে, দুটো খেলে ব্যথা কমে যাবে। দেব?”

পরীটা কোনো কথা বলল না, বড় বড় চোখে পিয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। পিয়াল একটু এগিয়ে এসে বলল, “তুমি কি উড়তে পারবে?”

পরীটা পাখা নেড়ে বলল, “জোছনা আলো পেলে যাব উড়ে উড়ে যাব।”

পরীটা কবিতার মতো সুর করে কথা বলে, আর গলার স্বর কী মিষ্টি, শুধু শুনতেই ইচ্ছে করে! পিয়াল বলল, “তা হলে তুমি উড়ে যাও। আমার মামা গেছেন একটা বাস্তু আনতে। যদি নিয়ে আসেন তা হলে বাস্তু ভরে নিয়ে যাবেন ঢাকা।”

পরীটা আবার সুর করে বলল, “নিবে নিবে ঢাকা নিবে—ঢাকা দিবে কেন?”

“ঢাকা দেবে না, ঢাকা নেবে। ঢাকা হচ্ছে একটা বড় শহর। সেখানে অনেক টেস্পো আর স্কুটার আর কালো ধোঁয়া। বাইরে বের হলেই চোখ জুলতে থাকে।”

পরীটা পিয়ালের কথা বুঝতে পারল বলে মনে হল না, কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। পিয়াল আবার বলল, “তুমি তাড়াতাড়ি উড়ে চলে যাও। আমার মামা বাস্তু নিয়ে এলে বড় বিপদ হয়ে যাবে।”

“কী হবে বিপদ?”

“তোমাকে বাস্তু ভরে নিয়ে যাবে।”

“নিবে নিবে কোথা নিবে? কেন নিবে মোরে?”

পিয়াল হাত নেড়ে বলল, “সেটা তুমি বুঝবে না। মানুষ কখনো পরী দেখে নাই, তাই পরী দেখিয়ে আমার মামা অনেক টাকা রোজগার করতে

চাইছে। চাকরিবাকরি নাই তো তাই মাথার মাঝে শুধু টাকা রোজগারের ধাক্কা।”

“টাকা? টাকা কিসে টাকা? টাকাতে কী হয়?”

“সেটা অনেক জটিল প্রশ্ন। টাকা দিয়ে কী হয় যদি না জান তা হলে তোমাকে বোঝানো খুব যুশকিল। তোমাকে এখন বোঝাতে পারব না। তুমি বরং ওঠো।”

পরী তার পাখা নেড়ে উঠে দাঁড়াল, ভেসে ভেসে চালাঘর থেকে বাইরে দাঁড়াল। জোছনার নরম আলোতে কী চমৎকার লাগছে পরীটাকে। পিয়াল জিজেস করল, “তোমার নাম কী পরী?”

“মোর নাম ফুলবতী।”

“বাহ! কী সুন্দর নাম! তুমি কোথায় থাক ফুলবতী?”

“মোরা থাকি ফুলবনে।”

“ইশ! কী মজা!” পিয়াল জিব দিয়ে শব্দ করে বলল, “তোমাদের ক্ষুলে যেতে হয়?”

“ক্ষুল কী তা চিনি না গো বলো বুঝিয়ে।”

“না চিনলে তোমাকে বুঝিয়ে মন-খারাপ করব না, খুব কঠিন জায়গা ক্ষুল। সব রাগী রাগী স্যারেরা আর আপারা থাকে—সাথে এই বড় বড় হোমওয়ার্ক!”

পরী ফুলবতী পাখা নেড়ে নেড়ে একটু উপরে উঠে এল। পিয়াল বলল, “ফুলবতী—তোমাদের শুধু মেয়ে-পরী কেন? ছেলে-পরী নাই?”

ফুলবতী খিলখিল করে হেসে বলল, “চাঁদ কেন দুটি নেই কে দেবে জবাব?”

“তোমরা কী খাও ফুলবতী?”

“জোছনার আলো খাই—ফুলের সুবাস খাই, খাই কুয়াশা।”

“ইশ কী মজা! কপকপ করে এখন তুমি জোছনা খাবে? জোছনা যেতে কেমন লাগে?”

“মিষ্টি মিষ্টি টক টক, খাও-না তুমি!”

“আমরা জোছনা যেতে পারি না। আমাদের ডাল দিয়ে মেখে ভাত যেতে হয়। সবজি বলে একটা জিনিস আছে সেটাও যেতে হয়। সবচেয়ে ভয়ংকর সবজির নাম করলা, তেতো যেতে।”

ফুলবতী পাখা নেড়ে খানিকটা উপরে উঠে আবার নিচে নেমে এসে বলল, “এই দূরে লোক দেখি আলো হাতে আসে।”

“মামা—আমার মামা। পালাও তুমি।”

“যাই তবে পিলাই।”

“পিলাই না, আমার নাম হচ্ছে পিয়াল।”

“পিয়াল পিয়াল তবে যাই উড়ে উড়ে।”

“যাও—আর ইয়ে মানে তোমাদের কোনো টেলিফোন আছে যেখানে মনে করো তোমাকে ডাকা যাবে?”

“টেলিফোন? সে আবার যন্ত্রণা কোন?”

“তা ঠিকই বলেছ, একটু যন্ত্রণাই বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে খুব কাজে লাগে। যেমন মনে করো আমার যদি তোমার সাথে কথা বলার ইচ্ছা করত ফোনে ডায়াল করে বলতাম, হ্যালো, ফুলবতী, কী চমৎকার জোছনা! যাবে নাকি একটু—তুমি শাইশাই করে উড়ে চলে আসতে—”

“এ আর সমস্যা কী, সমাধান সহজ!”

ফুলবতী আকাশে একপাক ঘূরে তার পায়ে বাঁধা নৃপুর খুলে পিয়ালের হাতে দিয়ে বলল, “পূর্ণিমার রাতে তুমি বাজিও নৃপুর, যেখা থাকি বৌজ পেয়ে চলে আসিব।”

“আসবে? সত্যি আসবে? খোদার ক্ষম?”

“তুমি এত ভালো ছেলে আসিব না কেন? যতবার চাও তুমি দেখা দিয়ে যাব!”

ঠিক তখন খুব কাছেই শওকত মামার গলার আওয়াজ শোনা গেল, উত্তেজিতভাবে কার সাথে জানি কথা বলতে বলতে আসছেন। ফুলবতী তখন আকাশ থেকে উড়ে নিচে নেমে এসে পিয়ালের গালে আলতোভাবে নিজের গাল শ্পর্শ করে আকাশে উড়ে গেল—যতক্ষণ দেখা গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিয়াল তাকিয়ে রইল।

শওকত মামা এসে পিয়ালকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়ে পেলেন, বললেন, “কী হল? তুই বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?”

“কেন? কী হয়েছে?”

“বললাম না একটু চোখে-চোখে রাখতে? যদি পালিয়ে যায়?”

“কী পালিয়ে যায়?”

“পরী।”

“পরী! কী বলছ? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠে দেখি তুমি নাই!”

মামা কেমন জানি রেগে উঠে চালাঘরে চুকে আবার বের হয়ে এলেন, “কোথায় গেল? কোথায় গেল পরী?”

“মামা, তুমি কী না কী স্বপ্ন দেখেছ! পরী কোথা থেকে আসবে?”

“কী বলছিস তুই? তুই নিজে কোলে করে পরীটাকে আনলি—মনে নাই জুতোর ফিতে দিয়ে বাঁধলাম?”

“আমি জানি না মামা। আমি ঘুমাছিলাম, ঘুম থেকে উঠে দেখি কেউ নাই। বাইরে এসে একটু জোছনা খাচ্ছিলাম—মানে দেখছিলাম—”

মামার সাথে আরও দুইজন মানুষ এসেছে, একজনের মাথায় একটা বড় বাঞ্চ। সে বাঞ্চটা নিচে রেখে বলল, “তখনই বলেছিলাম পাগল—মানুষের কথা শুনে কাজ নেই—”

শওকত মামা একটু রেগে বললেন, “আমি পাগল?”

দ্বিতীয় মানুষটা কানে গুঁজে রাখা একটা বিড়ি বের করে ম্যাচ দিয়ে ধরাতে ধরাতে বলল, “আপনি পাগল না ছাগল সেই তর্কে গিয়ে কাজ নাই। দুই হাজার টাকার কন্ট্রাষ্ট করেছেন, টাকা দেন চলে যাই।”

মামা চিন্কার করে বললেন, “পরী থাকলে দিতাম। পরী নেই খামাখা টাকা দেব কেন? আমাকে কি বেঙুব পেয়েছে?”

তোররাতে দিঘির পাশে খানিকক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি হল, শেষ পর্যন্ত কিছু টাকা দিয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা হল।

বাসে করে শওকত মামা আর পিয়াল ফিরে আসছিল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মামা বললেন, “বুঝলি পিয়াল? পরীর স্বপ্নটা যে দেখেছিলাম সেটা এত বাস্তব স্বপ্ন যে তুই চিন্তাও করতে পারবি না।”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ। দেখলাম তুই কোলে করে আনলি—হালকা তুলোর মতো পরী। একেবারে অতি বাস্তব।”

“কোনটা বাস্তব কোনটা স্বপ্ন সেটা বোঝা খুব মুশকিল মামা। খুব মুশকিল। মাঝে মাঝে যখন জোছনা দেখি তখন মনে হয় কপকপ করে খেয়ে ফেলি। কিন্তু বাস্তবে জোছনা কি খাওয়া যায়?”

“কী বললি?”

“নাহ। কিছু না।” পিয়াল হঠাৎ সুর করে বলল, “কিছু নাহি বলিলাম বলিলাম আমি।”

শওকত মামা অবাক হয়ে পিয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিয়াল খুব সাবধানে তার পকেটে-রাখা মূপুরটা স্পর্শ করে দেখল—হারিয়ে না যায় আবার!



তিনি ও বন্যা

রংনু আপা কাসে কবিতা পড়াতে পড়াতে হঠাতে করে খেয়ে গিয়ে বললেন,
“আমার মনটা ভালো নাই বে।”

রংনু আপা ক্ষুলের সবচেয়ে প্রিয় আপা—তাঁর মন ভালো নেই তবে সারা কাসের সবার মন-খারাপ হয়ে গেল। তিনি ভয় পেয়ে জিজেস করল, “কেন আপা? আপনার মন ভালো নেই কেন?”

রংনু আপা একটা নিশ্চাস ফেলে বললেন, “দেখছিস না, কী বন্যা হচ্ছে দেশে!”

“ও।” তিনি মুখে একটা দুশ্চিন্তার ভাব ফুটিয়ে রাখলেও মনেমনে নিশ্চিন্ত হল। যদি এরকম হত যে রংনু আপাকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে তা হলে সেটা হবে সত্যিকারের মন-খারাপের কথা।

রংনু আপা বাংলা বইটা টেবিলের উপরে রেখে একটু এগিয়ে এসে বললেন, “তোরা খবরের কাগজে টেলিভিশনে দেখছিস না দেশে কী ভয়ানক বন্যা শুরু হয়েছে?”

কাসের ছেলেমেয়েরা একটু নড়েচড়ে বসল। তারা মাত্র কাস থ্রীতে পাড়, খবরের কাগজ পড়তে তাদের একটুও ভালো লাগে না। সত্যি কথা বলতে কী, এই ছোট ছোট করে লেখাগুলি পড়ে বড়ুরা কী মজা পায় কে জানে! টেলিভিশনে তারা শুধু কাটুন দেখে। খবরের সময় যখন মন্ত্রীদের দেখানো শুরু হয় তখন তারা সব সময় টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়। এই কথাগুলি অবিশ্য রংনু আপাকে বলা যাবে না, তাই তারা চুপ করে রইল। খবরের কাগজ আর টেলিভিশনে না দেখলেও তারা অবিশ্য টের পাছে যে দেশে বন্যা হচ্ছে, বড়ুরা কথা বললেই আজকাল শুধু বন্যার কথা বলে।

স্বপন হাত তুলে বলল, “আপা!”

“কী হল স্বপন?”

“আমাদের এখানে কি বন্যা হবে?”

আপা মাথা নাড়লেন, “না। আমাদের এই এলাকা তো অনেক উঁচু তাই এখানে কখনো বন্যা হয় না।”

স্বপনের মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, “থাক বাবা! বেঁচে গেলাম আমরা।”

রূপু আপা স্বপনের দিকে তাকিয়ে একটা নিশাস ফেললেন, কোনো কথা বললেন না। তিনি চোখের কোনা দিয়ে একবার স্বপনকে আরেকবার রূপু আপাকে দেখল। স্বপনটা হচ্ছে এক নম্বরের গাধা, না হলে কেউ এরকম স্বার্থপরের মতো কথা বলে? এখানে বন্যা হচ্ছে না বলে যদি খুশি হতে হয় সেটা হতে হবে মনেমনে, জোরে জোরে সেটা কি বলা উচিত? স্বপনের কথা শুনে রূপু আপার নিশ্চয়ই মন-খারাপ হয়েছে, কিন্তু আপার মুখ দেখে সেটা বোকা গেল না।

স্বাতি হচ্ছে ক্লাসের ফাস্ট গার্ল—তাই সে ফাস্ট গার্লের মতো প্রশংসন করার জন্যে হাত তুলল। “আপা!”

“কী?”

“বন্যা কেন হয় আপা?”

“আমাদের দেশটাই আসলে বন্যা দিয়ে তৈরি। এই দেশের উপর দিয়ে শত শত নদী গিয়েছে। যখন বৃষ্টি হয় তখন বৃষ্টির পানি এই নদী দিয়ে সমুদ্রে যায়। যদি কখনো খুব বেশি বৃষ্টি হয় তা হলে নদী দিয়ে সব পানি যেতে পারে না—তখনই বন্যা হয়।”

“ও।” স্বাতি খুব গভীর হয়ে মাথা নাড়ল, যেন সবকিছু সে বুঝে ফেলেছে।

ইমরান হচ্ছে ক্লাসের সবচেয়ে ফাজিল, সে দাঁত বের করে হেসে বলল, “আপা, একটা খুব বড় ছাতা তৈরি করে বাংলাদেশের ওপর ধরে রাখলে কেমন হয়? তা হলে আর বৃষ্টি হবে না।”

ইমরানের কথা শুনে রূপু আপা ফিক করে হেসে ফেললেন আর তাঁকে হাসতে দেখে ক্লাসের আরও অনেকে হেসে ফেলল। বন্যায় এত মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, তার মাঝে হাসাহাসি করা ঠিক হবে কি না ঠিক বুঝতে পারছিল না। রূপু আপা বললেন, “বাংলাদেশে বৃষ্টি না হলেও তো বন্যা হতে পারে। নদীগুলি কি শুধু বাংলাদেশের বৃষ্টির পানি আনছে? ইন্ডিয়ার পানি আনছে, নেপালের পানি আনছে—তাই তোর ছাতাটা হতে হবে বিশাল! বাংলাদেশ,

ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান, হিমালয় পর্যন্ত দেকে ফেলতে হবে। এত বড় ছাতা নিয়ে তুই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি তো?”

সাগর বলল, “পারবে না আপা! পারবে না!”

রঞ্জু আপা মাথা নেড়ে বললেন, “পারবি না! আর আসলে বৃষ্টি আটকে ফেলাও তো ঠিক হবে না। বৃষ্টি ছাড়া পৃথিবী কি বেঁচে থাকতে পারে? সারা পৃথিবী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাবে। জীবন মানেই হচ্ছে পানি আর পানি হচ্ছে জীবন। যেখানে পানি নেই সেখানে জীবন নেই।”

স্বাতি ফার্স্ট গার্ল তাই বড় বড় জ্ঞানের জিনিস নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে, সে বলল, “মঙ্গলগ্রহে সেইজন্যে কোনো জীবন নেই—তা-ই না আপা?”

“হ্যাঁ তা-ই।”

ইমরান হাততালি দিয়ে বলল, “তার মানে বন্যাও নাই।”

“জীবন না থাকলে বন্যা হলেই কী আর না হলেই কী? আর তা ছাড়া বন্যা না হওয়াই যে ঠিক সেটাই কে বলতে পারে? আমাদের দেশে প্রতি বছরই তো বন্যা হয়। একটুআধটু বন্যা হলে কেউ কিছু মনে করে না, মাঠ-ঘাট ভলিয়ে যায় কয়দিনের জন্যে, পানি সরে গেলে জমিতে পলি পড়ে—সবাই এসব মেমে নিয়েছে। আমার কী মনে হয় জানিস?”

“কী আপা?”

“বাংলাদেশের মানুষ মনে হয় বন্যাকে একটু পছন্দই করে। সেটা কেমন করে বোবা যায় বল দেখি?”

স্বপ্ন বলল, “পানিতে ডুবে গেলে নৌকা করে যাওয়া যায়।”

“উহুঁ হল না।”

ইমরান বলল, “কুল বন্ধ হয়ে যায়—কুলে যেতে হয় না।”

রঞ্জু আপা হেসে বললেন, “সেটা তোর জন্যে ভালো খবর হতে পারে, কিন্তু সবার জন্যে তো ভালো না।”

“ঘরে বসে মাছ ধরা যায়?”

“উহুঁ।”

“টেলিভিশনে ছবি দেখা যায়?”

“উহুঁ হল না।”

“পারব না আপা। আপনি বলেন।”

“পারলি না? আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলি। মানুষ যে যে জিনিস পছন্দ করে সেই সেই জিনিসের নাম রাখে। যেমন মনে কর ফুল—মানুষ ফুলের নামে ছেলেমেয়ের নাম রাখে—যেমন ধর শিউলি, বকুল, জুই। মানুষ পাখির



নামেও নাম রাখে—যেমন ঘয়না। মানুষ সুন্দর রঙের নামে নাম রাখে, সবুজ, মীলা আসমণি। চাঁদ-সূর্যের নামেও নাম রাখে। সোনা মানিকও নাম রাখে। সেরকম মানুষ বন্যাও নাম রাখে। বন্যাকে তালো না বাসলে বন্যা নাম রাখত? কখনো রাখত না। কখনো শনেছিস কারও নাম রেখেছে ভূমিকম্প কিংবা ঝড় কিংবা ডায়ারিয়া?

তিনি হাত তুলে চিন্কার করে বলল, “আমার ছোট খালার নাম বন্যা খালা! বন্যা খালা!”

রুনু আপা হেসে বললেন, “হ্যাঁ, ঐ যে খুব সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়িকা রিজওয়ানা টৌধুরী বন্যা—”

স্বপন এবং সাগরও হাত তুলে চিন্কার করতে লাগল, দেখা গেল তাদেরও পরিচিত মানুষ রয়েছে যাদের নাম বন্যা।

রুনু আপা একটা নিখাস ফেলে বললেন, “কাউকে যদি কেউ পছন্দ করে তখন যদি সে কষ্ট দেয় তা হলে মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। বন্যার বেলাতেও তা-ই, মানুষ আদর করে বন্যা নাম পর্যন্ত রাখে, তার পরে যখন সেই বন্যায় মানুষ কষ্ট পায় সেই কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি।”

রুনু আপা কেমন যেন মন-খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন আর তাঁকে দেখে ক্লাসের সবাই মন-খারাপ করে বসে রইল। আপা বললেন, “মানুষের কষ্ট হলে কী করতে হয় বল দেখি?”

তিনি হাত তুলে বলল, “সাহায্য করতে হয়।”

“ঠিক বলেছিস। সাহায্য করতে হয়। সাহায্য করলে কষ্ট কমে যায়। আনন্দ আর কষ্টের মাঝে একটা পার্থক্য আছে। আনন্দ ভাগাভাগি করলে কখনো কমে যায় না, যত বেশি মানুষের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করা যায় আনন্দ তত বেড়ে যায়। কষ্টের বেলায় তার উলটো, মানুষের সাথে কষ্ট ভাগাভাগি করলে সেটা কমে যায়, তাই যখন মানুষের কষ্ট হয় তখন সেটা সবাই মিলে ভাগাভাগি করে নিতে হয়।”

রুনু আপা এত সুন্দর করে কথা বলেন যে শনে তিনির চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছিল। সে সাবধানে চোখের পানি আটকে রেখে মাথা নাড়ল। তিনি কষ্ট ভাগাভাগি করে নেবে, কষ্ট ভাগাভাগি করে সে কমিয়ে দেবে। কেমন করে সেটা কাজ করে সেটা অবিশ্য সে বুঝতে পারছিল না, তাই আবার হাত তুলল, বলল, “আপা!”

“কী হল তিনি?”

“কষ্ট কেমন করে ভাগাভাগি করতে হয়?”

“যেমন মনে কর তোর জন্মদিন আসছে, তখন তোর আবু তোকে জিজেস করল, ‘তিনি তুই কী উপহার নিবি�?’ তুই বললি ‘না আবু, এই বছর আমার কোনো উপহার লাগবে না, আমার উপহারের টাকাটা বন্যা আগ তহবিলে দিয়ে দাও।’ তখন কী হবে জানিস? জন্মদিনে তোর কোনো উপহার নেই বলে তোর মনে একটু কষ্ট হবে, সেই কষ্টটা আসলে অন্য একজনের কষ্ট। কষ্টটা তোর কাছে চলে এসেছে বলে তার আর কষ্ট হচ্ছে না। বুঝেছিস?”

তিনি মাথা নাড়ল, “বুঝেছি আপা।”

পরের কয়েকদিনে বন্যার অবস্থা ভালো না হয়ে আরও খারাপ হল। একদিন তিনিদের বাসায় মেহমান এসেছে, আস্থা তখন একজনকে পাঠালেন আইসক্রীম কিমে আনতে। সে খালিহাতে ফিরে এসে বলল, বন্যার জন্যে রাস্তা ডুবে গেছে তাই আইসক্রীম আসতে পারছে না। বাজারে নাকি পেঁয়াজও নেই। কয়দিন পর চাল-ডালও থাকবে না। পেঁয়াজ না থাকলে অবিশ্য তিনির কিছু আসে যায় না, সে পেঁয়াজ খায় না, কিন্তু চাল-ডাল না থাকলে তারা ভাত খাবে কেমন করে? প্রতিদিন খবরের কাগজে বন্যার ছবি বের হচ্ছে, মানুষেরা, ছোট বাচ্চারা বুকপানিতে ডুবে আছে, কী কষ্ট লাগে দেখলে!

একদিন তিনিদের স্কুলের উঁচু ফ্লাসের ছেলেমেয়েরা সব ফ্লাসে গেল বন্যার জন্যে সাহায্য তুলতে। যে যেভাবে পারে সেভাবে যেন সাহায্য করে, টাকা-পয়সা জামা-কাপড়, খাবারদাবার যা-কিছু ইচ্ছে তা-ই নিয়ে আসা যাবে।

বাসায় গিয়ে তিনি তার জমানো টাকা বের করল, তার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে একটা চকলেটের খালি কোটা থাকে, সেখানে সে অনেকদিন থেকে টাকা জমাচ্ছে। টাকা জমিয়ে সে কী করবে এখনও ঠিক করে নি, নিউমার্কেটে সে একটা পেঙ্গিল-বক্স দেখেছে—এত সুন্দর যে দেখলে মাথা ঘূরে যায়, সেটা কিনতে পারে। কিংবা বইমেলা থেকে কয়েকটা বই কিনতে পারে। সুন্দর কলম তার খুব ভালো লাগে, সেটাও কিনতে পারে। এখন অবিশ্য তিনি কথা—টাকাটা সে বন্যাত্রাণে দিয়ে দেবে। রঞ্জু আপা যেভাবে বলেছেন। কষ্ট ভাগাভাগি করে নিতে হয়—কষ্ট ভাগাভাগি করলে সেটা কমে যায়।

পরদিন যখন উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তাদের ক্লাসে এল, তিনি তার ব্যাগ থেকে কৌটাটা বের করে সব টাকা তাদের হাতে তুলে দিল। উঁচু ক্লাসের রায়হান ভাই অবাক হয়ে বলল, “সব টাকা দিয়ে দিচ্ছ?”

“হ্যাঁ।”

“সব টাকা তোমার দিতে হবে না। তোমার ঘেটুকু ইচ্ছে সেটুকু দিলেই হবে।”

তিনি গম্ভীর মুখে বলল, “আমি সবটাই দিতে চাই।”

“সত্যি?”

“হ্যাঁ।”

রায়হান ভাই কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তিনির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর টাকাগুলি গুনতে শুরু করল, তিনি অনেকদিন থেকে টাকা জমাচ্ছে, বেশির ভাগই খুচরা টাকা।

চিফ্টনের ছুটিতে সবাই ছোটছুটি করে খেলে, আজ বৃষ্টি হচ্ছে বলে কেউ বাইরে যেতে পারছে না, বারান্দায় ফ্লাসফরে লুটোপুটি করছে। ছোট জায়গার মাঝেই তিনিরা কুমির কুমির খেলা শুরু করেছে তখন হঠাৎ সুমন এসে হাজির হল। সুমন তিনির বড় ভাই—তার থেকে চার বছরের বড়, কিন্তু সব সময় এমন ভান করে যেন সে এত বড় হয়ে গেছে যেন কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তিনিকে ডেকে বলল, “তিনি, শোন।”

“কী ভাইয়া?”

“রায়হান ভাই বলেছে তুই নাকি সব টাকা বন্যার জন্যে দিয়ে দিয়েছিস?”

“হ্যাঁ।”

সুমন মুখ শক্ত করে বলল, “তুই একটা গাধা।”

তিনি মুখ কালো করে বলল, “কী? কী বললে?”

“আমি বলছি তুই একটা গাধা—এতগুলি টাকা নষ্ট করলি! আমাকে দিয়ে দিলি না কেন?”

“তোমাকে কেন দেব? তোমার কি বন্যাতে কোনো ক্ষতি হয়েছে?”

সুমন রাগ হয়ে বলল, “তুই কি ভাবছিস যে তুই মাদার তেরেসা হয়ে গেছিস?”

তিনির চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছিল, অনেক কষ্ট করে সে পানি আটকে রাখল। সুমন মুখ বাঁকা করে হেসে বলল, “দেশে কত বড় বন্যা হয়েছে জানিস? তিন কোটি মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে গেছে। এখন বিদেশ থেকে মিলিওন মিলিওন ডলার সাহায্য আসতে হবে! তুই ভাবছিস তোর দুইশো টাকা দিয়ে তিন কোটি মানুষ বেঁচে যাবে?”

“দুইশো না—দুইশো একত্রিশ টাকা।”

“ঐ হল—একই কথা। তিনি কোটি মানুষের মাঝে দুইশো একত্রিশ টাকা ভাগ করে দিলে একজনের ভাগে কতটুকু পড়ে? গাধা কোথাকার! খামোকা টাকাটা নষ্ট করলি।”

সুমন চলে ঘাবার পর তিনির এত মন-ঝারাপ হল যে বলার মতো নয়। তার চোখে পানি এসে গেল আর সেটা যেন কেউ দেখতে না পাবে সেজন্যে সে বারান্দার এক কোণায় দাঁড়িয়ে রইল। তার এত কষ্ট করে জমানো দুইশো একত্রিশ টাকা আসলেই কি নষ্ট হয়েছে? ভাইয়া তো ঠিকই বলেছে, যেখানে কোটি কোটি টাকা লাগবে সেখানে তার এই দুইশো একত্রিশ টাকা দিয়ে কী লাভ? বারান্দার কোণায় দাঁড়িয়ে থেকে যে বাতাসের সাথে সাথে বৃষ্টি এসে তাকে একটু একটু ভিজিয়ে দিচ্ছে সেটাও পর্যন্ত তার খেয়াল থাকল না। কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকত কে জানে কিছু হঠাত সেখানে রূপু আপা এসে হাজির হলেন, গলা উঁচিয়ে বললেন, “তিনি, বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজিস কেন?”

তিনি কোনো কথা না বলে বৃষ্টির ছাট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে একটু ভিতরে সরে এল। রূপু আপা তিনির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাত করে কিছু-একটা আন্দাজ করতে পেরে কাছে এগিয়ে এলেন। তিনির পিঠে হাত রেখে বললেন, “তিনি, কী হয়েছে?”

তিনি এবারে ভেউভেউ করে কেঁদে ফেলল। রূপু আপা মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “কী হয়েছে বল।”

“ভাইয়া বকেছে।”

“কেন বকেছে?”

“আমি নাকি টাকা নষ্ট করেছি।”

“টাকা নষ্ট করেছিস? কখন?”

“বন্যার জন্যে টাকা দিয়ে।”

রূপু আপা কিছু না বলে তিনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি ফৌপাতে ফৌপাতে বলল, “এত বড় বন্যার জন্যে নাকি কোটি কোটি টাকা লাগবে। ভাইয়া বলেছে সেখানে আমার টাকাগুলি দিয়ে কিছুই হবে না। শুধুশুধু নষ্ট করেছি।

“তুই কত টাকা দিয়েছিস?”

“দুইশো একত্রিশ টাকা।”

রূপু আপা চোখ বড় বড় করে বললেন, “তোর নিজের টাকা?”

“হ্যাঁ। আমি জমিয়েছিলাম।”

“ভেরি শুড়!” কন্নু আপা খানিকক্ষণ নরম চোখে তিন্নির দিকে তাকিয়ে
বললেন, তারপর বললেন, “তিন্নি!”

“কী আপা?”

“চোখ বন্ধ কর।”

তিন্নি অবাক হয়ে বলল, “চোখ বন্ধ করব?”

“হ্যাঁ।”

“কেন আপা?”

“আগে বন্ধ কর, তারপর বলছি।”

তিন্নি চোখ বন্ধ করল। কন্নু আপা বললেন, “কিছু দেখতে পাচ্ছিস?”

“না আপা।”

“ভালো করে দ্যাখ, খুব বন্যা হচ্ছে—পানিতে ভেসে যাচ্ছে—সেখানে
বুকপানিতে একটা মা দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছোট বাচ্চাকে বুকে শক্ত করে
ধরে রেখেছে। দেখতে পাচ্ছিস?”

তিন্নি চোখ বন্ধ করে কল্পনা করল বন্যায় সবকিছু ভেসে যাচ্ছে—
সেখানে একটা মা ছোট একটা বাচ্চাকে বুকে চেপে দাঁড়িয়ে আছে। কন্নু
আপা বললেন, “বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, মুখটা কী শুকনো। কেন
জানিস? বাচ্চাটার খুব অসুখ করেছে। স্যালাইন না দিলে বাচ্চাটা কিন্তু মারা
যাবে।”

তিন্নি স্পষ্ট দেখতে পেল ছোট বাচ্চাটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মুখ
শুকনো, চোখের নিচে কালি। কন্নু আপা আবার বললেন, “শুধু শুনতে
পাচ্ছিস তিন্নি?”

“কিসের শুধু আপা?”

“ট্রিলারের। ট্রিলার করে আশ নিয়ে এসেছে। খাবার পানি এনেছে, ওষুধ
এনেছে, স্যালাইন এনেছে। দেখতে পাচ্ছিস?”

তিন্নি স্পষ্ট দেখতে পেল ট্রিলারে করে লোকজন ওষুধপত্র খাবার সাহায্য
নিয়ে এসেছে।

“মায়ের কাছে ওষুধ আর স্যালাইন দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস?”

তিন্নি মাথা নাড়ল।

“এই যে বাচ্চার কাছে ওষুধটা দিচ্ছে সেটা কোথা থেকে এসেছে
জানিস?”

“কোথা থেকে?”

“তোর দুইশো একত্রিশ টাকা থেকে কেনা হয়েছে একশো টাকার
ওষুধ। আর একশো ত্রিশ টাকার খাবার। ভালো করে দ্যাখ, ওষুধ আর
স্যালাইন দিয়ে বাচ্চাটা ভালো হয়ে যাচ্ছে। দেখেছিস?”

তিনি সত্য সত্য দেখতে পেল ছোট বুগুণ বাচ্চাটা ভালো হয়ে উঠেছে, খিলখিল করে হাসছে তার মাকে ধরে। একটু আগে মায়ের মুখে কী দুশ্চিন্তা ছিল, এখন সেখানে কেনো দুশ্চিন্তা নেই—কী ভালো লাগছে দেখতে!

রংনু আপা তিনির কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, “বুঝলি তিনি—সত্য সত্য তোর টাকা দিয়ে একটা ছোট বাচ্চার জীবন বেঁচে যাবে। সেই বাচ্চাটা কে তুই হয়তো জানবি না, কিন্তু আছে একজন! বুঝলি?”

তিনি মাথা নাড়ল।

“এখনও মন-খারাপ আছে?”

তিনি মাথা নাড়ল, তার আর মন-খারাপ নেই। সে চোখ খুলে রংনু আপার দিকে তাকিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে বলল, “আপা!”

“কী হল?”

“এই যে ছোট বাচ্চাটার অসুখ করেছিল সে আসলে একটা ছোট মেয়ে।”

“তাই নাকি?”

“হ্যা। আর—”

“আর কী?”

“মেয়েটা তো অনেক ছোট তাই তার জন্যে খাবার বেশি লাগে না। একশো ত্রিশ টাকা থেকে একশো টাকা বেঁচে গেছে। সেই টাকা দিয়ে লাল একটা ফ্রক কিনেছে।”

রংনু আপা গভীর মুখে মাথা নাড়লেন, “ঠিকই বলেছিস।”

“লাল ফ্রকটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছে মেয়েটা।”

“কে না খুশি হবে এত সুন্দর ফ্রক পেলে!”

“আপা।” তিনি একটু ইতস্তত করে বলল, “আমি তো আসলে দুইশো একত্রিশ টাকা দিয়েছি—দুইশো ত্রিশ টাকা খরচ হয়েছে। এখনও এক টাকা রয়ে গেছে। মেয়েটাকে একটা লজেস কিনে দিই।”

“বেশি ছোট হলে কিন্তু খেতে পারবে না, গলায় আটকে যাবে। দেখিস।”

“না আপা, বেশি ছোট না। চুষে চুষে খেতে পারবে।”

“ঠিক আছে, তা হলে একটা লজেস কিনে দে।”

তিনি আবার চোখ বন্ধ করল, টুকটুকে লাল ফ্রক গায়ে দেওয়া ছেটি মেয়েটিকে সে এখন একটি লজেস কিনে দেবে।